আমাদের ভাষা-শিল্পী

শ্রীহরিপদ মান্না এম. এ

সূচী-পত্র

আমাদের ভাষা-শিল্পী

কবি কৃত্তিবাস

বাংলার নিভৃত পল্লী—যেখানে আধুনিক সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল আলোকের কণাটুকু ও প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, আবার সভ্যতা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর বাংলার শ্রেষ্ঠ নগরী যেখানে পল্লীর কুসংস্কার, অজ্ঞতা, দীনতা ক্ষণিকের জন্য ও তাহাদের ছায়াপাত করিতে পারে নাই সেই উভয় স্থানেই শুনিতে পাওয়া যায়—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ
পাঁচালী প্রবন্ধে কৈল গীত রামায়ণ।

ধনীর দুয়ারে ও নিঃস্বের পর্ণকুটীরে উভয় স্থানেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ একটি শুদ্ধশুচি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বাংলার কবিরা ঐ রামায়ণ হইতে পাইয়াছেন তাঁহাদের লেখ্যবিষয়, গৃহী পাইয়াছে গৃহধর্ম্মের উপদেশ,

শোকাতুরা মা পাইয়াছে তাহার অন্তহীন শোকে সান্ত্বনা, সংসারত্যাগী পাইয়াছে পারমার্থিক জগতের সন্ধান। এই গ্রন্থ বাংলার বালক, বৃদ্ধ, যুবক, পুরুষ, স্ত্রীলোক সকলের জীবনে যোগাইয়াছে অনুপ্রেরণা, শিখাইয়াছে সংসারক্ষেত্রে প্রতিটী পদক্ষেপ করিবার নিয়ম, দুঃখে দিয়াছে শান্তি, আনন্দে দিয়াছে সংযম।

রামায়ণ গ্রন্থখানি বাল্মীকির রচিত। ইহা সুললিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা। যুগযুগান্ত হইতে ইহা ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে অধীত হইয়া আসিতেছিল। সংস্কৃত শিক্ষিত পণ্ডিতেরা ইহার রসের ছিটা ফোঁটা সংস্কৃত অনভিজ্ঞ লোকদের দিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করাইত। কিন্তু তাহাতে তাহাদের হৃদয়ের আশা মিটিত না। প্রায় পাঁচশত বৎসর আগে আমাদের বাংলাদেশে একজন কবি তাঁহার স্বদেশবাসীর হৃদয়ের ঐ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াছিলেন নিজ মাতৃভাষায় সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ করিয়া। তিনি কবি কৃত্তিবাস। এখনকার প্রত্যেক বিখ্যাত ব্যক্তির বা ঘটনার তারিখ সন মিলাইয়া ইতিহাস রক্ষিত হয়; তখন এইভাবে রক্ষিত হইত না। তাই কবি কৃত্তিবাস ঠিক কোন সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করা কষ্টকর। পণ্ডিতেরা নানারূপ প্রমাণ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন তিনি রাজা গণেশের সময় বাংলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজা গণেশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজত্ব

করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সময় হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর বহু কবির লেখনীর বহু আঁচড় হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এখনও অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে তাহাই আশ্চর্য্য।

কবি তাঁহার রচিত কাব্যে কালের বিবরণ ঠিকভাবে রাখিয়া না গেলেও বংশ পরিচয় কতকটা ঠিকভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা জানিতে পাই আদিশূর কনৌজ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের অধস্তন পুরুষ ছিলেন নরসিংহ ওঝা। তিনি সুবর্ণগ্রামের রাজা বেদানুজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সুবর্ণগ্রামে অরাজকতা উপস্থিত হইলে তিনি সেস্থান ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে বসবাস করিবার জন্য ফুলিয়ায় উপস্থিত হন। ফুলিয়া তখন সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। বহু ফুলের বাগান ছিল বলিয়া ইহার নাম হয় ফুলিয়া। কবির কথায় বলিতে হয়,

মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চেতে থানা
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা।
গ্রাম রত্ন ফুলিয়া যে জগতে বাখানি
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী।
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি,
ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়এ সন্ততি।

নরসিংহ বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ফুলিয়া গ্রামে বেশ পসার প্রতিপত্তি করিয়া

বসিলেন। নরসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ। গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারী ওঝা বেশ পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। মুরারীর পুত্র বনমালী কৃত্তিবাসের পিতা। কৃত্তিবাসের মাতার নাম মেনকা। তাঁহার আরও পাঁচ ভাই ছিলেন।

শৈশবে কৃত্তিবাস চতুষ্পাটীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। সেখানে সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি গৌড়েশ্বরের রাজকবি হইবার জন্য উপস্থিত হন। গৌড়েশ্বরের রাজসভায় প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য তিনি সাতটী শ্লোক লিখিয়া রাজার কাছে পাঠাইয়া দেন। গৌড়েশ্বরের সহিত দেখা করিবার জন্য কত লোকই উপস্থিত। তাই সেদিনের তরুণ, নবীন কবির প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। কিন্তু গুণগ্রাহী রাজার দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি কবিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সপ্তঘটি বেলা যখন দগড়ে পড়ে কাটি
শীঘ্রধারা আইল দূত হাতে সুবর্ণ লাঠি।
কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ।

তরুণ কবি দুরুদুরু হিয়ায় রাজার কাছে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে পাত্রমিত্র বেষ্টিত হইয়া রাজা সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার চারিদিকে কত পণ্ডিতের সমারোহ। তিনি প্রথমে হতবাক্ হইলেন কিন্তু তাহা ক্ষণিকের। তাহার পর তিনি অনর্গল শ্লোকের পর শ্লোক বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার জিহ্বায় সরস্বতীর অধিষ্ঠান। সুতরাং কোন ভয়, কোন

সঙ্কোচ তাঁহার জিহ্বায় জড়তা আনিল না। রাজা সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি নানাদ্রব্য দিয়া কবিকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন এবং তাঁহাকে সভাকবি করিয়া সংস্কৃত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করিতে আদেশ দিলেন। ফুলিয়ার কৃত্তিবাসের সারা বাংলার কৃত্তিবাস হইবার পথ এইভাবে প্রস্তুত হইল।

তাহার পর তিনি দিনের পর দিন হিন্দুস্থানের রামায়ণকে বঙ্গস্থানের রামায়ণরূপে অনুবাদ করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই অনুবাদ সময়ে তিনি যে হুবহু সংস্কৃত পদের পরিবর্ত্তে বাংলাপদ বসাইলেন তাহা নয়। রামায়ণকে একেবারে বাঙ্গালীর রামায়ণ করিয়া, বাঙ্গালী ছাঁচে ফেলিয়া, বাঙ্গালীর হৃদয় দিয়া তিনি এক নূতন গ্রন্থের সৃষ্টি করিলেন। তিনি বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় চিনিতেন। কোনভাব কোথায় কিভাবে দিলে বাঙ্গালীর হৃদয়কে অভিভূত করিবে তাহা তাঁহার ভালভাবে জানা ছিল। তাই বাল্মীকির রামায়ণে যেখানে রামচন্দ্রকে অতি কঠোর মূর্ত্তিতে কল্পনা করা হইয়াছে সেখানে কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্র একেবারে খাঁটী নিরীহ বাঙ্গালী ভদ্রলোক। বাংলা প্রেমের রাজ্য। এখানের আকাশে, বাতাসে, প্রকৃতির মধ্যে দয়া, প্রেম, ভালবাসারই চিত্র ফুটিয়া উঠে। কঠোরতা, দয়াহীনতা এদেশের মাটীতে শোভা পায় না। তাই কৃত্তিবাসের রামায়ণে বীর হনুমান রাম বলিতে অজ্ঞান। রামের পরম শত্রু রাক্ষসেরাও অনেক সময় যুক্তকরে রামনামের গুণগানে মত্ত। এইভাবে বইখানি অনুদিত

হইয়াছিল বলিয়া আজ পাঁচশত বৎসর বইখানি সমানভাবে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে আদৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া তাঁহার রচনাটীও সুন্দর। ইহাতে উপমার আতিশয্য নাই, অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, কৃত্রিমতার জঞ্জাল নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু ধর্ম্ম-গ্রন্থ নয়, ইহা তখনকার সামাজিক চিত্রও বটে। ইহাতে আমাদের প্রত্যেক লোকের কর্ত্তব্যের যে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে তাহাই ইহাকে কালজয়ী করিয়া কালের বুকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। একখানি বইএর ভিতর এমন ভাইএর চিত্র, এমন পত্নীর চিত্র, এমন পিতামাতা, শত্রুমিত্রের চিত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না।

কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী বহু কবি রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের রচনা কৃত্তিবাসের রচনা-সাগরে মিশিয়া গিয়া কৃত্তিবাসেরই হইয়া গিয়াছে। তাই মূল রামায়ণে যাহা ছিল কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহা নাই, কৃত্তিবাসের রামায়ণে যাহা ছিল এখনকার রামায়ণে তাহা নাই। যে কবির যে লেখাটুকু সুন্দর হইয়াছে তাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণে ঢুকিয়া কৃত্তিবাসের লেখা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। যেমন অঙ্গদ রায়বার নামক পরিচ্ছেদটী এখনকার রামায়ণে হাস্যরসের একটী চমৎকার পরিচ্ছেদ। কিন্তু মূল কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই পরিচ্ছেদটী খুজিয়া পাওয়া যায় না।

শুধু বিষয়বস্তু যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নহে, ভাষাও বহুস্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মুঞি, করা্যা, থুয়্যা, পাকল

প্রভৃতি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন হইয়াছে আমি, করিয়া, রাখিয়া, রক্তবর্ণ ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতে ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিয়া এ পরিবর্ত্তন কেহ গ্রাহ্য করে নাই। যেমন

পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি ॥

সেইস্থানে এখন হইয়াছে

রক্ত নেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি,
দন্ত কড়মড় করে দেয় গালাগালি।

রামায়ণ ছাড়াও কয়েকখানি বইতে কৃত্তিবাসের ভণিতা দেখা যায় কিন্তু সেই সব পুস্তক তত প্রসিদ্ধ নয় এবং কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া মনেও হয় না।

কৃত্তিবাস কবে স্বর্গারোহণ করেন তাহার সঠিক বিবরণ জানা যায় নাই। তাঁহার আবির্ভাব কালটাই বাঙ্গালীর জানা, তিরোভাবের কালটা জানা নাই। কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয় কৃত্তিবাসের কি মৃত্যু হইতে পারে?

কবি রামপ্রসাদ

আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমক হারাম নয় মা শঙ্করী।
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে
ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।

হিসাবের খাতায় এই হিসাবই লেখা হইতেছিল। কতদিন যে এইভাবে লিখা হইত তাহা বলা যায় না যদি দোকানের মালিক তাঁহার কাজের হিসাব চুকাইয়া না দিতেন। কিন্তু দোকানের মালিক না হয় তাঁহার কাজের হিসাব চুকাইয়া দিয়াছেন বাঙ্গালী কি ঐ লেখকের লেখার হিসাব চুকাইয়া দিতে পারিয়াছে? দিলে আজ বারে বারে তাঁহাকে ডাক পড়িত না গানের আসরে, হৃদয়ের প্রেরণার আসরে। এই গানের লেখক শ্রীরামপ্রসাদ সেন। তিনি গরাণহাটার শ্রীদুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীর দোকানের হিসাব খাতার উপর এই গানটী লিখিয়াছিলেন। গানটী দেখিয়া দোকানের মালিক তাঁহাকে কাজে ইস্তফা দিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার খাওয়া পরার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মাসিক ত্রিশ টাকার বৃত্তি তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ বৃত্তিতে তাঁহার বেশ আনন্দে দিন

চলিয়া যাইত। তিনি মনের সুখে নিজের বাটী [illegible] হতে গানের পর গানের মালা গাঁথিয়া তাঁহার আরাধ্যা দেবী কালী মায়ের পায়ে দিতেন।

বাঙ্গলাদেশে তখন ভাবের প্লাবন আসিয়াছে। শ্যামা সঙ্গীত, বৈষ্ণব সঙ্গীত তখন বাঙ্গালীর গৌরবের [illegible]। সংস্কৃতের খোলস ভেদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা তাহার নিজের রূপে সেই মাত্র ধরা দিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য নাই বলিলেই চলে, যা আছে তা অতি নগণ্য। সাধারণ লোক সাহিত্য বলিতে কি তাহা বুঝে না। এমন সময় রামপ্রসাদ ভাবুক বাঙ্গালী জাতিকে গানের ভিতর দিয়া সাহিত্যের আসরে লইয়া গেলেন।

রামপ্রসাদ জন্মিয়াছিলেন গঙ্গার তীরে কুমারহট্ট হালি-সহরের এক বৈদ্য বংশে। সে প্রায় আনুমানিক ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে। রামপ্রসাদের পিতা, পিতামহ সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনিও বংশের উপযুক্ত ছেলে হইয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ও পার্শী সাহিত্য ভালভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়ার জন্য আদ্যাশক্তি ভগবতীর উপর তিনি অধিকতর নির্ভরশীল হইয়াছিলেন। সেই জগজ্জননীকে মাতৃরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার কাছে আত্ম-নিবেদন করিয়া তিনি শান্তি পাইতেন। মনিবের চাকুরী হইতে ছাড় পাইয়াই তিনি গঙ্গার ধারে বসিয়া শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। পথে বা নদীতে যাঁহারা যাইতেন তাঁহারা তাঁহার

গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। প্রাণের সঙ্গে যে কাজের যোগ থাকে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। রামপ্রসাদ যে গান রচনা করিতেন তাহা কবি প্রসিদ্ধি লাভের জন্য নয়, মাকে লাভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিদ্যাসুন্দর রচনাতে। নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন; কিন্তু সে কাব্যের সহিত প্রাণের যোগ ছিল না। তাই শ্যামা সঙ্গীতের তুলনায় তাহা অতি নিকৃষ্ট কাব্য হইয়াছিল। দুই রকম কবিতার তুলনা করিলেই পার্থক্য স্পষ্টপ্রতীয়মান হইবে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে,

কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনী
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনী কাত্যায়ণী
কাটে কাল কোটাল, কর মা প্রতিকার
কপর্দ্দিকামিনী কিবা করুণা তোমার।

শ্যামা সঙ্গীতে,

মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়
ছ'টা কলুর অনুগত।

শ্যামা সঙ্গীতগুলি যেন কবি প্রাণের উৎসধারা আর বিদ্যাসুন্দর যেন পাহাড়ের তুষার গলা জলের ধারা যাহার রসের যোগান আপন বুকে নয় অন্যত্র। শ্যামাসঙ্গীতের বেশীর ভাগ গান মাতৃভাবের গান। তাই সেখানে দেবী হিসাবে একটা অহেতুক শ্রদ্ধা, ভয়, ভক্তি আসিয়া গানগুলির সাধারণ প্রবাহে বাধা দেয় নাই।

রামপ্রসাদ শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তান্ত্রিক আচার অনুসারে শক্তিপূজা করিতেন এবং মায়ের প্রসাদী মদও পান করিতেন। বৈষ্ণবেরা তাহাতে তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেন। সেই সময় কুমারহট্ট হালিসহরে আজু গোসাই নামে একজন বৈষ্ণব ছিলেন। তিনিও রামপ্রসাদের মত মুখে মুখে গান বাঁধিতে পারিতেন। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে গানের লড়াই হইত। তাঁহাদের লড়াইতে আর কিছু হউক বা না হউক বাংলা সাহিত্য তাহার ভাণ্ডারে অনেকগুলি রত্ন পাইয়াছিল।

যেমন,

রামপ্রসাদ গাইলেন,

ডুব দে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন   দু চার ডুবে ধন না পেলে
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুল কুণ্ডলিনীর কূলে।

আজু গোসাই গাইলেন,

ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।
একে তোমার কফো নাড়ি, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি;
তোমার হলে জ্বর জাড়ী মন
যেতে হবে যমের বাড়ী।

এমনিভাবে দিনের পর দিন রামপ্রসাদ গানের পর গানের মালা গাঁথিয়া যাইতে লাগিলেন। কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, শিবকীর্ত্তন প্রভৃতি কত গান রচনা করিলেন।

তিনি শুধু গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। প্রত্যেকটী গানেই তিনি সুর দিয়াছিলেন। প্রত্যহ স্নান করিবার সময় গঙ্গায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি অনেকক্ষণ গান গাহিতেন। গঙ্গার স্রোতের মত সে গানের স্রোত বাংলাদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বহিয়া গিয়াছিল। গঙ্গার স্রোতের মত সে গানের স্রোত বাঙ্গালীর মনে আনন্দের ও প্রাণের প্রাচুর্য্য আনিয়া দিয়াছিল। তাই কতদিন রামপ্রসাদ মরিয়া গিয়াছেন; তাঁহার গান, তাঁহার গানের সুর ছায়া ঘেরা পল্লীতে ও সহরের পাষাণবুকে আজও শুনা যায়।

একথা বলা অনাবশ্যক যে রামপ্রসাদ শুধু কবি ছিলেন না, তিনি বড় সাধকও ছিলেন এবং সেই সাধনার বলে শক্তিরূপী শ্যামা মাকে তিনি লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে এক সময় তিনি শ্যামা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বেড়া দিতেছিলেন

আর শ্যামা মা তাঁহার মেয়ে সাজিয়া বেড়ার ওপাশ হইতে বেড়ায় গিরা ধরাইয়া দিতেছিলেন। সাধনার চরমস্তরে তিনি উঠিয়াছিলেন। শেষে শ্যামা মার সহিত তাঁহার কোন প্রভেদ মনে হইত না। মৃত্যুকে তিনি ভয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই। রামপ্রসাদ প্রত্যেক বৎসর শ্যামা পূজা করিতেন; পূজার পর প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় ঘট লইয়া নিজে গঙ্গায় যাইতেন। মৃত্যুর বৎসরেও তেমনি ঘট লইয়া গঙ্গায় নামিলেন এবং শ্যামা সঙ্গীত গান করিতে লাগিলেন।

তিলেক দাঁড়াও ওরে শমন
মনভরে মাকে ডাকিরে।
আমার বিপৎকালে ব্রহ্মময়ী
আসেন কি না আসেন দেখিরে।

এইরূপ গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া ব্রহ্মজ্যোতি নির্গত হইল। আত্মীয় স্বজনেরা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কবি ও সাধক রামপ্রসাদ চলিয়া গেলেন। তাঁহার গানের সুর রহিয়া গেল। আজও তাই তিনি গানও সুরের ভিতর দিয়া বাঙ্গালী জাতিকে শ্যামা মায়ের পায়ের দিকে লইয়া চলিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক।
প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে
ছুটি গিয়া ছুটাছুটি বাড়ী এসে সবে।
সহরের কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায় জাঁক
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক।
কর্ত্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া
কাঁঠালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া।
দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া বসে
চিটে গুড় ছিটা দিয়া পিটে খান কসে।

বাংলার পৌষ-পার্ব্বণের দৃশ্য!

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা—"মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটী বাঙ্গালী কবি জন্মে না, জন্মিবার জো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই। বাংলার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির দিকে না গেলে খাঁটী বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা বৃত্রসংহার পরিত্যাগ করিয়া পৌষপার্ব্বণ চাই না, কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষ পার্ব্বণের যে একটি সুখ আছে বৃত্রসংহারে তাহা নাই।"

বাঙ্গালী আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া আপনার যাহা কিছু সব ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছে কে জানে? কিন্তু বাংলার যাহা নিজস্ব তাহার কথা চিন্তা করিতে এখনও বাঙ্গালীর মনে আনন্দ হয়। তাই পৌষ পার্ব্বণের গর্ব্ব করিবার দিন চলিয়া গেলেও পিঠাপুলি সেবনের তৃপ্তির কথা ভুলা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পিঠাপুলির কবি ছিলেন। সে সব কবিতা এখন বৃত্রসংহার, পলাশীর যুদ্ধ, গীতাঞ্জলির যুগে অচল, কিন্তু কাব্যের জন্যই কবিতা পড়িয়া সব সময় সুখ হয় না; মানুষের যা নিত্যপ্রয়োজন তাহার কাব্য যে সাহিত্যে আছে সে সাহিত্যের জন্যও মাঝে মাঝে মনের আকাঙ্খা হয়। তাই এই নব্য আধুনিক যুগেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ডাক পড়ে সাহিত্যরস পরিবেষণের জন্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মিয়াছিলেন যখন বাংলার নিজস্ব যুগ সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। এই যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া তিনি বৃটিশের নবারুণের কিরণচ্ছটার আভাষও পাইয়াছিলেন। প্রাচীন ও নবীনের তিনি সেতুবন্ধ। রামপ্রসাদ, আজু গোঁসাই, নিধুবাবু একদিকে আর হেমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র অন্যদিকে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের মাধ্যমে পরস্পরের ভাব বিনিময় করিয়াছিলেন। তাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত চিরদিন বাংলার সাহিত্য-জগতে জীবিত থাকিবেন।

১২১৮ সালের ২৫শে ফাল্গুন কাঁচড়াপাড়ার এক বৈদ্য বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত ও

মাতার নাম শ্রীমতি দেবী। হরিনারায়ণের আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না, কোনরূপে দিনাতিপাত হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র ছেলে বয়সে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। লেখাপড়া শিক্ষায় আদৌ মনোযোগ ছিল না। কবি ও হাফ আখড়াইয়ের দলে ঘুরিয়া বেড়ান ও গান রচনা করা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ ছিল। তাঁহার এক জেঠতুতো ভাইএর সঙ্গে তাঁহার কবির লড়াই হইত।

দশবৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। হরি-নারায়ণ আবার বিবাহ করিলে তিনি রাগ করিয়া কলিকাতায় তাঁহার মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ঐখানে তিনি কিছু সংস্কৃত লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষা করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ওদিকে বিশেষ অনুরাগ না থাকায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। পনের বৎসর বয়সের সময় গুপ্তিপাড়ায় গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামনির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু এ বিবাহ তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। তাই স্ত্রীকে তিনি কাছে রাখেন নাই ; কিন্তু তাঁহার ভরণ-পোষণের সমস্ত ব্যয় ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে মাকে হারাইয়া, বিমাতার আচরণে বিরক্ত হইয়া, স্ত্রীকে প্রেমময়ীরূপে না পাইয়া তিনি স্ত্রী-জাতির উপর সব সময় একটা বিরূপভাব পোষণ করতেন। বহু কবিতায় স্ত্রী-জাতির প্রতি তাঁহার এই বিরূপভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

সাড়ী পরা এলোচুল আমাদের মেম্
বেড়ায় নেটিভ লেডি, শেম্, শেম্, শেম্।
সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি
নসী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শ্যামী গুল্কি।

খাস মেমদের ঠাট্টা করিয়া বলিতেন,

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।"

নিজের খেয়ালে কবিতা লেখার আনন্দে তিনি তাঁহার সব অভাব ভুলিয়া যাইতেন। কবিতা লিখেন, নিজে পড়েন, অপরকে পড়ান এমনি ভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। দৈবক্রমে পাথুরিয়া ঘাটার সুবিখ্যাত গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। এই বন্ধুত্বের ফলে উভয়ের চেষ্টায় ১২৩৭ সালে ১৬ই মাঘ (১৮৩১ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী) সংবাদ প্রভাকর নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইল। যোগেন্দ্রমোহনের অর্থ ও ঈশ্বরচন্দ্রের লেখনী এই সাপ্তাহিক পত্রিকা খানিকে বাংলার সাহিত্য চর্চার পীঠস্থান করিয়া তুলিল।

এখনকার মত সংবাদ পত্রের ছড়াছড়ি তখন আমাদের দেশে ছিল না। সংবাদ প্রভাকর মাত্র একখানি পত্রিকা ছিল যাহার মারফৎ বাংলা সাহিত্যের রীতি-নীতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে ইহা প্রভাকরই প্রথম

দেখায়।" দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবীশ ছিলেন।

সংবাদ প্রভাকরে তখনকার সাহিত্যের নানা বিষয়ের চর্চা ছাড়া তিনি পুরাতন কবিওয়ালাদিগের গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে সমস্ত গান ও কবিতা আমরা পড়ি তাহার অধিকাংশই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহ। তাঁহার এই সংগ্রহ না থাকিলে হয়তঃ রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), রামবাবু (মোহন), হরু ঠাকুর প্রভৃতি বাংলার বিখ্যাত কবিওয়ালারা আজ বাঙ্গালীর স্মৃতিতে অখ্যাত ও লুপ্ত হইয়া যাইত। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্র-মোহনের মৃত্যুতে সংবাদ প্রভাকরেরও মৃত্যু হইল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের ভিতর প্রতিভার যে উৎস দেশবাসী দেখিয়াছিল তাহার মুখ তাহারা বন্ধ করিয়া দিতে রাজী হইল না। আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ঐ বৎসর সংবাদ রত্নাবলী বলিয়া একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিলেন এবং সম্পাদনার ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপর দিলেন। সংবাদ রত্নাবলী ছাড়া তিনি পাষণ্ডপীড়ন, সংবাদ সাধুরঞ্জন প্রভৃতি পত্রিকা অতিশয় যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র খুব বেশী শিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া তিনিই তখনকার দিনের একমাত্র বাঙ্গালী ছিলেন যিনি লেখনীর উপর নির্ভর করিয়া অন্নবস্ত্রের

সংস্থান করিয়াছিলেন। প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর ও বোধেন্দুবিকাশ ইঁহার নামকরা বই। তাঁহার কাব্য খণ্ড খণ্ড কবিতায় বিবিধ ভঙ্গীতে বিবিধ বিষয়ে লেখা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এমনি তাল মিলাইয়া লেখা যে সে সময় কখনও শেষ হইয়া যাইবে না।

রসভরা রসময়, রসের ছাগল
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।
স্বর্ণকুঁকী রত্নগর্ভা জননী তোমার
উদরে তোমায় ধরে ধন্য গুণ তার।
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান
সাধু, সাধু, সাধু তুমি ছাগীর সন্তান।

ছাগলের এ গুণ গান বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাইবে না সত্য কিন্তু কাল যে ইহাকে একেবারে মুছিয়া দিবে তাহাও মনে হয় না। ঈশ্বরচন্দ্রের সব রকম লেখা ছিল। ছোট ছেলেদের জন্য কবিতার মধ্যে হিতোপদেশ, রসিকদের জন্য রসের ফোয়ারা, যুবকদের জন্য রক্ত উন্মাদিনী স্বদেশী গান, বৃদ্ধদের জন্য প্রাণভোলা পারমার্থিক গান। তিনি বাস্তববাদী ছিলেন। তাই জীবনের সমস্ত দিক, সমস্ত পর্য্যায় তাঁহার কবিতার ভিতর ধরা পড়িয়াছিল।

তিনি অতিশয় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, পয়সা যতক্ষণ হাতে থাকিত ততক্ষণ কেহ চাহিয়া তাঁহার কাছ হইতে বিমুখ হইত না। ইঁহার বাড়ীতে অন্নপ্রার্থী হইয়া কেহ উপস্থিত

হইলে তিনি তাহাকে নিরাশ করিতেন না। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন,

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে।
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে
নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে।
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে।

এমনি ধরণের উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু আমরা এ সংসারে তাঁহাকে বেশী দিন পাই নাই। মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে ১২৬৫ সালে সজ্ঞানে ভাগীরথী তীরে তিনি স্বর্গলাভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় আবার বলি, "আজিকার দিনের অভিনব উন্নতির পথে সমারূঢ় বাঙ্গলা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় মনে হয় আহা কত সুন্দর কিন্তু এ বুঝি পরের, আমাদের নহে। তাই ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাংলা।" আমরা সকলে বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একমত হইব। যতদিন আমাদের বাঙ্গালীত্ব থাকিবে ততদিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাদের মধ্যে জীবিত থাকিবেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গালী জাতির একটি স্মরণীয় দিন। ঐদিন যে মহাপুরুষ বাঙ্গলার ধূলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার বিদ্যা, পৌরুষ, মহানুভবতা ও দয়ায়

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাঙ্গালী জাতি সমস্ত ভারতবর্ষে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এই মহাপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ধনীর দুলাল হইয়া জন্মগ্রহণ করেন

নাই। তিনি দারিদ্র্যের রুদ্রবহ্নি মাথায় বহন করিয়াই পৃথিবীর বুকে শান্তিময়ী বারিধারা দান করিয়াছিলেন। তারই ফলে নির্ধনের শুষ্কমুখ হাস্যমুখর হইয়াছিল, বিধবার শুষ্কপ্রাণে প্রেমের মঞ্জরী দেখা দিয়াছিল, দুর্ব্বোধ্য বাংলাভাষা আপামর জনসাধারণের বোধগম্য হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় এক ধনী মাড়োয়ারীর অধীনে ৮৲ মাহিনার চাকুরে ছিলেন। তাঁহার মাতা ভগবতী দেবী বীরসিংহ গ্রামের একজন দয়াবতী পল্লীরমণী ছিলেন। তিনি বীরসিংহ গ্রামে থাকিয়া শৈশবকালীন নানারূপ দুরন্তপনার মধ্য দিয়া পাঁচ বৎসর অতিক্রম করেন। তাহার পর তাঁহাকে গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। ঐ পাঠশালায় তিন চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন। ঐখানে তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির নানা পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পর তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। মাইল পোষ্ট দেখিয়া ইংরাজী অঙ্ক শিক্ষা করা শুধু ঈশ্বরচন্দ্রের মত অদ্ভুত মেধাবী ছাত্রের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

যে মাড়োয়ারীর বাড়ীতে ঠাকুর দাস থাকিতেন সেই মাড়োয়ারী দয়া করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বহু বাধা বিপত্তির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মাত্র নয় বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। তাহার পর চলিয়াছে প্রতিভা ও সাংসারিক আবেষ্টনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ। রাত্রে পড়িবার তৈল নাই, পরিধানের উপযুক্ত পোষাক নাই।

ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত খাদ্য নাই তবু ঈশ্বরচন্দ্র অটল, অচল! শ্রেণীর পর শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়াছেন। অল্প-বয়স্ক বালকের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া অধ্যাপক মণ্ডলী চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছেন। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিশাল বারিধি অতিক্রম করিতে তাঁহার মাত্র ১২ বৎসর ৪ মাস সময় লাগিয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর যে দিন তিনি সংস্কৃত কলেজের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইলেন সেদিন পণ্ডিত সমাজ ও জনসাধারণ অল্পবয়স্ক এই যুবকের মধ্যে যে প্রতিভার দীপ্তি দেখিয়াছিল তাহা বোধ হয় সংস্কৃত কলেজের অন্য কোন ছাত্রের মধ্যে দেখিতে পান নাই।

সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইয়া তিনি প্রথমে ফোর্ট-উইলিয়ম্ কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিলেন। ঐ পদের বেতন ছিল মাত্র ৫০৲ টাকা। ঐ বেতনেই বাসা খরচ চালাইয়া ভাইএর পড়ার খরচ দিয়া নিজে হিন্দী ও ইংরাজী শিখিবার জন্য দুই জন পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি হিন্দী ও ইংরাজীতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার সাহিত্য রচনার দিকে মন যায়। তাঁহার সাহিত্য সাধনার হাতে খড়ি সংস্কৃত শ্লোকের মধ্য দিয়া হয়। সংস্কৃতে নানা বিষয়ের শ্লোক ও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি বহুবার পুরস্কার লাভ করেন। এই সময় রাম মাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মারা যাওয়ায়

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ খালি হয়। ঐ পদের পক্ষে তিনি যোগ্য লোক বিবেচিত হন। ১৮৪৬ খৃঃ ৫০৲ টাকা বেতনে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন। ঐ পদে আসিয়া তিনি তাঁহার শিক্ষার সত্যিকার যোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের মারফত তখন এদেশীয়দের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। এই কলেজের সংস্কারে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। এইখানেই তিনি উপলব্ধি করিলেন এদেশের লোকদের শিক্ষিত করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলা ভাষারও প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বাংলা সাহিত্যের দিকে তিনি তাকাইলেন। সেখানে দেখিলেন তর্কালঙ্কার, ন্যায়ালঙ্কার, কাব্যবিশারদ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুস্বার, বিসর্গ ও সমাসের বোঝা লইয়া বসিয়া আছেন। পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ বাঙ্গালীর সেখানে প্রবেশ করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বাংলাভাষার অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইলেন। তিনি সংস্কৃত রচনার লেখনী ত্যাগ করিলেন। বাংলা মায়ের দুঃখ তাঁহাকে বিচলিত করাইল। তিনি সাধারণ বাঙ্গালীদের বোধ-গম্য ভাষায় প্রথম বাংলা গ্রন্থ লিখিলেন "বাসুদেব চরিত।" তাহার পর ১৮৪৭ খৃঃ প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হইল বেতাল পঞ্চবিংশতি। ঈশ্বরচন্দ্রের মত সংস্কৃত জানা বিশেষজ্ঞের হাত দিয়া যে এমন সহজ, সরল বাংলা ভাষা বাহির হইতে পারে ইহা দেখিয়া জনসাধারণ আশ্চর্য্য হইল। তিনি বাংলা ভাষাকে

অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর হইতে মুক্ত করিয়া সৌম্য, সরল ও সৌন্দর্য্যশালিনী করিলেন।

"পরিশেষে নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রাজা নির্দ্দিষ্ট প্রেত ভূমিতে উপনীত হইলেন ; দেখিলেন কোন ও স্থলে অতি বিকট মূর্ত্তি ভূত প্রেতগণ জীবিত মানুষ ধরিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে, কোনও স্থলে ডাকিনীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া তদীয় অঙ্গপ্রতঙ্গ চর্ব্বণ করিতেছে।" ইহা বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষা। এইরূপ সহজ ও সরল বাংলাভাষা বোধ হয় তখনকার দিনে কোন বাঙ্গালী স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

১৮৫১ খৃঃ ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াই কি করিয়া এই কলেজের সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি করা যায় তাহার জন্য মন দিলেন। কত অধ্যক্ষ তাঁহার আগে আসিয়াছেন কিন্তু কাহারও লক্ষ্যে পড়ে নাই যে সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠিন সূত্রগুলি পড়িতে ছাত্রদের কত কষ্ট হয়, কত সময় ও শক্তি অপচয়িত হয়। তিনি অধ্যক্ষ হইয়াই ছেলেদের সে কষ্ট লক্ষ্য করিলেন। সেই বৎসর বাহির হইল বোধোদয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ প্রভৃতি বই। তাহার পর ব্যাকরণ কৌমুদী, বর্ণপরিচয় প্রভৃতি বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক তিনি ছেলেদের জন্য রচনা করেন। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়কেই তিনি প্রাচীন পন্থার রুদ্ধ গৃহ হইতে বাহির করিয়া নূতন জগতের আলোক দিলেন। তাঁহার এই শিক্ষা সংস্কার সরকারী বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাই কলেজের

অধ্যক্ষতা ছাড়া তাঁহাকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটী জেলার অতিরিক্ত ইনসপেক্টর নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার সর্ব্বমোট মাহিনা হইল ৫০০৲ টাকা। বাংলাদেশে জনশিক্ষার এক নূতন পরিকল্পনা লইয়া তিনি কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি বহুস্থানে মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

তাঁহার এইরূপ প্রতিপত্তি কোন কোন উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারীর মনঃপূত হইল না। তিনি ছিলেন স্বাধীন প্রকৃতির লোক। অসম্মানের ভিত্তির উপর প্রতিপত্তির সৌধ গড়িয়া উঠিবে তাহা সহ্য করিবার মত লোক তিনি ছিলেন না। তাই তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে চটি পায়ে দিয়া উত্তরীয় মাত্র সম্বল করিয়া ৫০০৲ টাকার চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন। কোন লোকের অনুরোধ উপরোধ তিনি শুনিলেন না। ইহার পর তাঁহার সাংসারিক জীবনে নানাভাবে অর্থ কৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আর সরকারী চাকুরীর দিকে তিনি দৃক্পাত করেন নাই। দেশ জননী ও মাতৃভাষার সেবাতেই তিনি জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। বিধবার চোখের জল তাঁহার কোমল অন্তঃকরণকে উদ্বেলিত করিয়াছিল। তাঁহার অন্তরের এই উদ্বেল প্রকাশ পাইয়াছিল "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তক খানিতে।

"হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত

বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকতা রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরমধর্ম্ম আর যেন এদেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।" বিধবা বিবাহ ২য় পুস্তক।

এদেশ মাতৃকার প্রতি তাঁহার প্রীতির উৎস ধারা একদিকে যেমন লোকাচার ও অন্যায়ের জঞ্জালকে ভাসাইয়া দূর করিয়াছে তেমনি উষর বঙ্গভাষাকে শস্যশালিনীও করিয়াছে। সাহিত্য ও সমাজ তাঁহার হাতে পড়িয়া নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর এরূপ বহুবিধ সমাজ সংস্কারের কাজের সহিত জড়িত থাকিয়াও ভাষাকে সম্পদশালিনী করিয়া গিয়াছেন। এই-খানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি ছিলেন দয়ার অবতার! দুঃখীর অন্নবস্ত্রের অভাব, বিধবার চোখের জল, অশিক্ষিতের মর্ম্মবেদনা তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। তাই সারাজীবন ধরিয়া এইগুলি দূর করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও একাগ্রতা দেখিয়া এদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ইংরাজ তাঁহাকে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য করিয়াছেন।

তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহাকে শুধু পুস্তক বিক্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া কাটাইতে হইয়াছে। সীতার বনবাস, আখ্যান-মঞ্জুরী, ভ্রান্তি বিলাস, পদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থ এবং কয়েকখানি হিন্দী ও সংস্কৃত পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতাঠাকুর কাশীতে স্বর্গারোহণ করেন। তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার মাতা কাশী লাভ করিয়াছিলেন। মাতাপিতার মৃত্যুতে তিনি প্রাণে অতিশয় আঘাত পান। তাঁহার জীবনসূর্য্যও পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। তাই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া নানা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আবার স্ত্রী দীনময়ীর মৃত্যু হইলে তিনি একেবারে বিচলিত হইয়া পড়েন। তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রবল হিক্কার ব্যারামের সহিত জ্বর আসিয়া দেখা দিল। বহু বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা সত্ত্বেও ১৮৯১ খৃঃ ৭০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গে গমন করিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর—হায়রে জীবন হ্রদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা ডরি শমনে
মক্ষিকাও গলেনা গো পড়িলে অমৃত হ্রদে।

বাংলার কবি মধুসূদন অমৃত হ্রদেই পড়িয়াছিলেন। তাই তাঁহার রোগ, শোক, যন্ত্রণাময় জীবন শেষ হইয়াছে কিন্তু তিনি বাংলার অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক হিসাবে চিরদিনের জন্য বাঁচিয়া রহিয়াছেন। সংসারে তিনি কোনদিনের জন্য বোধ হয় শান্তি পান নাই। তাঁহার অমিতব্যয়িতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহাকে সংসারিক অশান্তির চরমে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি কবি, তাঁহার কল্পনার চক্ষে তিনি যে স্বর্গ রচনা করিয়াছিলেন এবং ভোগ করিয়াছিলেন তাহাই তিনি বাঙ্গালী জাতিকে দান করিয়া গিয়াছেন। সেখানে কোন অশান্তি নাই, ক্ষণিকের জন্যও মানুষ তাহার দুঃখ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া দেখে,

রাজছত্র, মণিময় আভা
শোভিল দেবেন্দ্র শিরে, রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি ঢুলায় চামরী।

আইলা সুসমীরণ, নন্দন কানন
গন্ধ মধু বহি রঙ্গে, বাজিল চৌদিকে

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ত্রিদিব বাদিত্র, ছয়রাগ মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। ইত্যাদি···

তাহা সাধারণ মানুষকে ক্ষণিকের জন্য অমৃত হ্রদে লইয়া যায়; যেখানে কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, [illegible] শান্তি। মধুসূদন নিজে সেই অমৃত হ্রদে পড়িয়াছেন, বাঙ্গালী জাতিকে তাহার দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

যশোহর সহর হইতে আট মাইল দক্ষিণে সাগরদাঁড়ি গ্রাম। গ্রামকে তিন দিকে বেষ্টন করিয়া আছে ক্ষীণস্রোতা কপোতাক্ষী। তাহার কূলে বৃক্ষশাখায় পাখী ডাকে, দূরে শ্যামল প্রান্তরে শস্যশীর্ষ মৃদুবাতাসে দুলিতে থাকে, জলে মৎস্যের সঙ্গে ছোট ছোট শিশুরা ক্রীড়া করে, এমনি কাব্যে-ঘেরা প্রকৃতির মাঝে মধুসূদন আসেন ১৮২৫ খৃঃ ২৫শে জানুয়ারী। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতার নাম জাহ্নবী দেবী। মধুসূদন বাপ-মায়ের শেষ সন্তান। সুতরাং আদর যত্নের কার্পণ্য কোন দিন অনুভব করেন নাই। রাজনারায়ণ বাবু কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতের নাম করা উকীল ছিলেন। কিন্তু উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাভাবে সে সমুদয় অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। পিতার এ স্বভাব পুত্রের মধ্যেও সংক্রমিত হইয়াছিল। গ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কাছে মধুসূদনের পড়াশুনা আরম্ভ হয়। মধুসূদনের লেখাপড়ার প্রতি অসাধারণ আগ্রহ ছিল এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি ক্লাশের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে গণ্য হইয়াছিলেন। এই সময় মায়ের কাছে তিনি রামায়ণ মহাভারত পাঠ শুনিতেন এবং ঐ গুলির অনেক অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার

মনের অন্তস্থলে গ্রথিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুস্তক মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণের এবং বীরাঙ্গনা কাব্য মহাভারতের অংশ বিশেষ লইয়া রচিত। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যে তিনি বারবার বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন।

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে বাল্মীকি।"

বার কি তের বৎসর বয়সের সময় রাজনারায়ণ বসু তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই সময় মধুসূদনের জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। সেই সময় শিক্ষিত লোকদের ভিতর ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ করিবার এই উগ্র প্রবৃত্তি দেখা দেয়। দেশের যাহা কিছু তাহাই খারাপ এবং ইংরাজের যাহা কিছু তাহাই ভাল এই বিশ্বাসে দেশের ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা বিশ্বাসী হইয়াছিল। বিলাতী সভ্যতা, বিলাতী রাজনীতি, বিলাতী আচার ব্যবহার এমন কি খৃষ্টান ধর্ম পর্য্যন্ত এদেশের শিক্ষিত লোকেরা গ্রহণ করিতে থাকে। সমাজের এই আবহাওয়া মধুসূদনের চরিত্রের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। মধুসূদনের বাবার পয়সার অভাব ছিল না। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে তিনি সাহেবদের পুরাদস্তুর অনুকরণ করিলেন। এমন কি হিন্দুর অভক্ষ্য পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। বাংলাভাষাকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা এবং তাহাতে কবিতাও প্রবন্ধাদি লেখা তাঁহার প্রিয় বস্তু হইল।

মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন তখন তাঁহার বাবা দেশের একজন জমিদারের মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু এ বিবাহে তিনি রাজী হইলেন না। যখন শুনিলেন তাঁহার বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে তখন তিনি বাড়ী হইতে হঠাৎ পলায়ন করিলেন এবং আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। পরে সকলে জানিলেন তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী ওল্ডমিশন গির্জায় তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর তাঁহার নাম হয় মাইকেল মধুসূদন। ছেলের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের কথা শ্রবণ করিয়া পিতামাতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। সমাজের ভয়ে তাঁহারা আর মধুসূদনকে ঘরে স্থান দিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার পড়ার সমস্ত ব্যয়ভার রাজনারায়ণ বাবু বহন করিতে লাগিলেন।

ইহার পর তিনি শিবপুরের বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়িতে লাগিলেন। রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিলাসিতার জন্য মাঝে মাঝে তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন। ইহাতে তিনি উদ্ধতভাবে পিতার কথার জবাব দিতেন। রাজনারায়ণ বাবু মর্মাহত হইয়া পুত্রের অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার কতই না আশা ছিল; কিন্তু পিতার অর্থ সাহায্য বন্ধ হইবার পর তিনি দেখিলেন তাঁহার সমস্ত স্বপ্নই আকাশ কুসুমের মত কোথায়

পর তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন।

মধুসূদনের ছেলেবেলা হইতেই বিলাত যাইবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। ব্যারিষ্টারী পাশ করিতে পারিলে অর্থকষ্ট অনেকটা মোচন হইবে এই আশায় তিনি পৈতৃক জমি জায়গার একটা ব্যবস্থা করিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং সেখানে গ্রেস ইনএ ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু মধুসূদনের ভাগ্যে কোন দিনই সুখ ছিল না। স্ত্রী হেনরিয়েটা অর্থকষ্টে পড়ায় দুইটি সন্তানসহ বিলাতে উপস্থিত হইলেন। একে মধুসূদন নিজের খরচ সঙ্কুলান করিতে পারিতেছিলেন না তাহার উপর তাঁহার স্ত্রী সন্তানসহ সেখানে যাওয়ায় তাঁহার অর্থকষ্ট চরমে উঠিল। যে মধুসূদন একদিন রাজা মহারাজার ছেলের মত বিলাসের প্রাচুর্য্যে দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেই মধুসূদন একবেলা খাইয়া কোন রকমে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। দেনার দায়ে তাঁহার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার অবস্থা হইল। বিদ্যাসাগরের দয়ায় কোন রকমে দিন কাটাইয়া পাঁচ বৎসর পরে ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে থাকাকালীন তিনি চতুর্দ্দশ পদাবলী নামক বিলাতী সনেট ধরণের কতকগুলি কবিতা লিখেন। এইরূপ কবিতাও বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম প্রায় হাজার খানিক টাকা

ব্যারিষ্টারীতে উপার্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অমিতব্যয়িতার জন্য কোন দিনই তিনি অর্থকষ্ট মিটাইতে পারেন নাই। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করিবার জন্য তিনি জীবনে কত চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। তাই দুঃখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন।

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে।
জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে।

কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আশার নেশা ভাঙ্গিল। তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং সমস্ত ভুলিবার জন্য অতিরিক্ত মদ্যপান আরম্ভ করিলেন। অর্থকষ্ট ও মানসিক দুশ্চিন্তায় তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুটী অন্নের সংস্থান করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল। আগেই জমি জায়গা বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। এখন পরিচ্ছদ ও গৃহসজ্জা বিক্রয় করিয়া কোন রকমে তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। স্বামী ও স্ত্রীর অসুখ যখন খুব শক্ত হইল হেনরিয়েটা জামাতা গৃহে ও মধুসূদন হাঁসপাতালে গেলেন। ছেলে দুইটী বন্ধু মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিন আগে তাঁহার স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যু হইল। মধুসূদন কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "হায়, ভাগবান আমাদের দুজনকে একসঙ্গে

সমাহিত করলে না কেন? কিন্তু আমারও আর বেশী বিলম্ব নাই।" বিলম্ব সত্যই ছিল না। তিন দিন পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন তিনি দেশ জননীকে ছাড়িয়া চলিলেন। এইভাবে মেঘনাদ বধ কাব্যের কবি জ্বালাময় জগৎ ত্যাগ করিয়া অমৃতময় স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন, মরলোকের জন্য রাখিয়া গেলেন অমর কাব্য।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় এমন একটা সময় আসিয়াছিল যখন বাঙ্গালীরা মনে করিত সাহেবদের যে কোন অনুকরণই ভাল। সাহেবরা মদ খায়, গোমাংস খায়, হিন্দুদের ভিতর যে তা না করিল সে আবার আধুনিক কিসে? সে আবার এ্যাংলো বেঙ্গলী সমাজে পাংক্তেয় হইবে কি করিয়া? সাহিত্যের আসরেও ইংরাজী সাহিত্যের অনুকরণ আসিয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার প্রবর্ত্তক। কবি হেমচন্দ্র তাঁহার যোগ্য শিষ্য। কিন্তু হেমচন্দ্র শুধু ইংরাজদিগের অনুকরণই করেন নাই। নিজের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে সে অনুকরণকে রূপ দিয়াছেন নূতন এক গরিমায়। তাই মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যের পাশে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারকে দাঁড় করাইলে দুই ভাই বলিয়া মনে হয় না।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জেলার রাজবলহাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল কৈলাসচন্দ্র ও মাতার নাম ছিল আনন্দময়ী। কৈলাসচন্দ্র তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে বাস করিতেন। মোটা ভাত কাপড়ের অভাব তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কৈলাসচন্দ্রের শ্বশুরের মৃত্যু হওয়ায় ভাত কাপড়ের অভাব ঐ পরিবারে দেখা দিল। ঐ অভাব মিটাইবার জন্য হেমচন্দ্রকে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হইল। আনন্দময়ী হেমচন্দ্রকে একটী চাকুরী করিয়া দেওয়ার জন্য

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীকে অনুরোধ করিলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় হেমচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া তাঁহার পড়ার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া দশ টাকা বৃত্তি পাইলেন এবং তাহার পর কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এই সময় তাঁহার বিবাহ হওয়ায় সংসারের অভাব অনটন আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু সে অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা তখন তাঁহার ছিল না। এই অভাবের তাড়না তাঁহার মনের মধ্যে একটা স্পষ্ট ছাপ রাখিয়া দিয়া গিয়াছিল। যখন ওকালতী করিয়া তিনি মাসিক দুই হাজার টাকা উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তখনও যেন সেই ছেলেবেলার ছাপ মাঝে মাঝে তাঁহার মনে দেখা যাইত।

তিনি লিখিয়াছেন,

বিধাতা হে নাহি জানি প্রাণে কেন হেন গ্লানি
মাঝে মাঝে বিরক্তি উদয়।
থাকিতে এ ভবনিধি পরাণে কেন এ ব্যাধি
বল নিধি বলহে আমায়।
আজ নয়, নহে কাল এই ভাব চিরকাল
কেন মন হেন তিক্ত হয়।
কিছুই না ধরে মনে অসাধ সদাই প্রাণে
কিছুতেই সাধ নাহি যায়।

তাই বলিয়া আমরা মনে করিব না তিনি দুঃখের কথা ছাড়া, দুঃখের গান ছাড়া আর কিছুই রচনা করেন নাই। তিনি দুঃখ পাইয়াছিলেন সাধারণ মানুষে যা পায় সেই হিসাবে; কিন্তু তিনি মন পাইয়াছিলেন সাধারণ মানুষে যা পায় সে হিসাবে নয়। তিনি সাধারণের বাহিরে মন পাইয়াছিলেন; তাহা কবি মন। কবি মনে জগতের সব মনেরই ছবি ধরা পড়ে। তাই হাস্যরসে হেমচন্দ্র কম ছিলেন না। ভোট দেওয়াকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,

ভোটিং হলে মিটিং এবার জোটে কত লোক।
কেহ গোরা, কেহ দুধে, কেহ কৃষ্ণ জোঁক।
বাঁকা টেরী, হাতে ঘড়ি, একমেটে গড়ন।
কামিজ আঁটা নধর বাবু নাগর কোন জন।
কেহ বা দোমেটে গাঁদা, কেহ ঘেঁটুরাজ।
মাথা ছাটা মেইদী কেহ, কেহ সিমূল ভাঁজ।

এই হাসির ঝড়ে বাঙ্গালী জাতির গ্লানি উড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টাও তিনি কম করেন নাই। তিনি জাতির মধ্যে পরিবর্ত্তন চাহিয়াছিলেন, তিনি সমাজের সংস্কার চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নিন্দার রুদ্রমূর্ত্তি আঁকিয়া লজ্জায় ও গ্লানিতে তিনি দোষীদের অভিভূত করিতে চাহেন নাই। হাসির ভিতর দিয়া, দোষীদের ও হাসাইয়া তাহাদের সংশোধন চাহিয়াছিলেন। ঐ ধরণের লেখা তাঁহার অনেক পদ্য আছে। বাঙ্গালী মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,

হায়, হায় ঐ যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—
মুখের সাপটে দড়, বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে, কথার তুফান।
নমস্কার তার পায়ে পাড়ায় বেড়ানী,
পেট্‌টা ভরা কুঁজড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি।
কথায় আকাশে তুলে হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে তার নিন্দাবাদ।
খেয়ে যান, নিয়ে যান, আর যান চেয়ে,
হায় হায় ঐ যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।

সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় হেমচন্দ্র পাশ করিয়া আবার একবার তিনি ভারতী মার কাছে বিদায় লইলেন। পঁয়ত্রিশ টাকার একটী কেরাণীর চাকুরী যোগাড় করিয়া কোনরূপে তিনি সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের মনে কিছুতেই শান্তি আসিল না। তিনি বাড়ীতে বসিয়া বসিয়াই বি, এ, পরীক্ষায় পাশ করিবার পর কেরাণীর চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া শিক্ষকতা লইলেন এবং আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এইবার তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করিলেন। লক্ষ্মীর কৃপা তাঁহার উপর বর্ষিত হইল, অন্নকষ্ট দূরীভূত হইল। ভারতীমায়ের অর্চনা করিবার সুযোগ তিনি লাভ করিলেন। অর্চনার প্রথম পুরস্কার বীরবাহু কাব্য। যে দিন বাঙ্গালী পাঠকের কাছে ইহা উপস্থিত হইল সেদিন তাহারা চমৎকৃত হইল। এতদিন হেমচন্দ্রকে

তাহারা দেখিয়াছে কেরাণী হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে, মুন্সেফ হিসাবে, সাধারণ মানুষ হিসাবে। এইবার হেমচন্দ্রকে তাহারা দেখিল কবি হিসাবে, কথার ছন্দে মনের ছন্দ প্রকাশ করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট অসাধারণ মানুষ হিসাবে। হেমচন্দ্র বাঙ্গালী-দিগের ভিতর একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিলেন। তাহার পর তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হইল 'বৃত্রসংহার', 'আশা কানন', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি কত কি কাব্য!

ওকালতীতে তাঁহার মাসিক আয় প্রায় দুই হাজার টাকা হইতে লাগিল। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া এখন তাঁহার কোন কিছুর অভাব নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জের পিতা সপ্তম এড্ওয়ার্ড যুবরাজ হিসাবে ভারতে আসেন। কলিকাতায় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে সভা হয় তাহাতে হেমচন্দ্রের একটী কবিতা পঠিত হয়। তিনি দেশকে কত ভালবাসিতেন, কত বড় মনে করিতেন তাঁহার দু একটী কবিতাতে তাহা পরিস্ফুট হয়। যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা সভায় যে কবিতাটী পঠিত হয় তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

ভারত কিরণে জগৎ কিরণ,
ভারত জীবনে জগৎ জীবন।
আছিল যখন শাস্ত্র আলোচন,
আছিল যখন ষড় দরশন,
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,

খুঁজিত সকলে পূজিত সকলে
ফিনিক্ষ সিরিয়া য়ুনানী মণ্ডলে
ভাবিত অমূল্য মাণিক যথা।

ভারত সঙ্গীত পদ্যে তিনি লিখিয়াছেন।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনও উন্নত,
সেই জাহ্নবী বারি এখনও ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?
বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রয় ?

তিনিই বোধ হয় বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম কবি যিনি শিক্ষিত বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর নিদ্রাভঙ্গের জন্য এমনিভাবে শিঙ্গা বাজাইয়া ডাক দিয়াছিলেন। ওকালতীতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতেছিল। তিনি সরকারী উকীলও হইয়াছিলেন, এক সময় তাঁহার হাইকোর্টের জজ্‌ হইবারও সম্ভাবনা হইয়াছিল কিন্তু স্বাধীনভাবে কাব্যালোচনার বাধা হইবে বলিয়া তিনি সে চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে সে শক্তি ক্ষীণতর হইতে হইতে

একেবারে নষ্ট হইল। তিনি অন্ধ হইলেন। হেমচন্দ্র প্রচুর উপার্জন করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুই সঞ্চয় করেন নাই। অন্ধ হইবার পর তাঁহার অর্থ-কষ্ট উপস্থিত হইল। গভর্ণমেণ্টের মাত্র ২৫৲ টাকা বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি কাশীবাসী হইলেন। সেখানে বহু দুঃখ যন্ত্রনার পর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার এত দুঃখের ভিতরও আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন,

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন।
দারাপুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার
বলে জীব কর না ক্রন্দন।
মানব জীবন সার, এমন পাবে না আর,
বাহ্য দৃশ্যে ভুলোনা রে মন।
কর যত্ন হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয়
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙ্গালীর যে কী মহৎ, কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। তৎপূর্ব্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না, সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজী পণ্ডিতেরা

বর্বর জ্ঞান করিতেন।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। সত্যই যখন বঙ্কিমের আবির্ভাব হয় তখন প্রাচীনকে ছাড়ি ছাড়ি করিয়াও বাঙ্গালী তাহাকে ছাড়িতে পারিতেছিল না, নূতনকেও আপনার বলিয়া একেবারে অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে পারিতেছিল না। বাঙ্গালী সমাজে সংস্কৃত ভাষা জীর্ণ কাঠামোর উপর তখনও দাঁড়াইয়াছিল। পুরাতন ও জীর্ণ হইলেও লোকে বনেদী ঘর বলিয়া তাহার দিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকাইত। আর নব্যসমাজ খাস বিলাতীকে নকল করিয়া ইংরাজী দালান কোঠা সাজাইয়া দেশবাসীর চমক লাগাইতে ছিল। কিন্তু সাধারণ জনসমাজ কবি কঙ্কনের চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া কোন রকমে তৃপ্ত ছিল। এই যুগ সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমের আবির্ভাব। তিনি দেখাইলেন বাংলায়ও গদ্য সাহিত্য হয়, বাংলায় উপন্যাস হয়, বাংলায় সমালোচনা সাহিত্য হয়। বাংলায় আদি হইতে কবিতা ত ছিল সে কথা বাদই দিলাম।

১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় রাত্রি ৯টার সময় চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া নামক স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যাদবচন্দ্র মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকাল মেদিনীপুরেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ৭ বৎসর বয়সের সময় তিনি মেদিনীপুরের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন।

অতি অল্পদিনের ভিতর তিনি পড়াশুনায় চমৎকার ফল দেখাইলেন। শিক্ষকরা তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি ডবল প্রমোশন পাইতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে বঙ্কিমের স্বাস্থ্য খারাপ হয় সেইজন্য যাদবচন্দ্র তাঁহার ডবল প্রমোশন বন্ধ করিয়া দিলেন। এমন সময় যাদবচন্দ্র ২৪ পরগণায় বদলী হইলেন। বাধ্য হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি হুগলী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বঙ্কিমের ভিতর অধ্যয়নের প্রবল আকাঙ্খা ছিল। কলেজের বিশাল লাইব্রেরীতে তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সানন্দে সেইখানে কাল কাটাইতে লাগিলেন। বাহিরের খারাপ সংসর্গে আসিবার আর সুযোগ পাইলেন না। কলেজের পাঠাগারে কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপিয়ার, মিল্টন প্রভৃতির লেখার সহিত তিনি পরিচিত হইলেন।

তখনকার দিনে বি, এ, এম, এ, পরীক্ষা ছিল না। জুনিয়ার, সিনিয়ার স্কলারসিপ্ পরীক্ষা ছিল। ঐ পরীক্ষাগুলি বেশ শক্তও ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অদ্ভুত প্রতিভার গুণে মাত্র এগার বৎসর বয়সেই ঐ পরীক্ষা সমুত্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিলেন। তাঁহার নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের তাঁহার বাড়ীতে ঘন খন যাতায়াত সুরু হইল। তখনকার দিনের সামাজিক রীতি অনুসারে ঐ অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে ভালভাবে সংস্কৃত শিক্ষা

করিতে লাগিলেন, ইংরাজী সাহিত্যের ও নানা লেখকের বই পড়িতে লাগিলেন। এই সময় বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত দীন অবস্থা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর ও সাধুরঞ্জন নামক দুইটী সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেন। উহাতে তখনকার লেখকদের কবিতার লড়াই হইত। বঙ্কিমচন্দ্র সে সুযোগ ছাড়িলেন না। বঙ্কিমের লেখার মৌলিকতা দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে লেখার সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। পনের ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ ললিতা ও মানস প্রকাশিত হইল। কিন্তু কবিতা লেখা অপেক্ষা গদ্য লেখাতে বঙ্কিমের বেশী পটুতা ছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উহাকে গদ্য লিখিতে উপদেশ দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গদ্য লেখায় মন দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করিয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১২৬২ সালে বি, এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তিনি আইন পড়া ছাড়িয়া দিয়া বি, এ পড়িতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করিয়া বি, এ পরীক্ষার পাঠ্য সমাপ্ত করিয়া তিনি ঐ বৎসরই বি, এ উপাধি লাভ করিলেন। বি, এ পাশ করিবার পর বি, এল পরীক্ষাতে ও তিনি উত্তীর্ণ হন।

মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া তিনি যশোহরে আসেন। যাঁহার প্রতিভা আছে জীবনের কোন ক্ষেত্রে তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অদ্ভুত বিচার

শক্তি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। এই সময় তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। তিনি আবার বিবাহ করেন। রাজকার্য্য ব্যপদেশে নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি ২৪ পরগণনায় আসিলেন। ঐখানে ১২৭১ সালে তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী বাহির হইল। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে অভ্যস্ত বাঙ্গালী জাতি বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সেইদিন দুর্গেশনন্দিনীর দিকে তাকাইল। বাংলা সাহিত্যে এক নূতন যুগের সূচনা হইল। ইহার আগে আলালের ঘরের দুলাল প্রভৃতি দু' একখানি উপন্যাস বাজারে বাহির হইলেও দুর্গেশনন্দিনীর সহিত কি ভাষায়, কি ভাবে কিছুতেই তাহাদের তুলনা হইতে পারে না। ইহার পর বাহির হইল কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী।

বাংলার গদ্য সাহিত্যের গগনে রাত্রির তিমিররেখা কাটিয়া এইভাবে ধীরে ধীরে প্রভাত সূর্য্যের উদয় হইল। প্রাচীন লেখকেরা তাঁহার সহজ ভাষার সাহিত্যকে ঠাট্টা করিয়া হাল্কা-প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আর ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের লোকরা বাংলায় জন্মিয়াও বাঙ্গালীর লেখা বলিয়া সে লেখাকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের লোক লইয়া গঠিত নয়। উহাদের বাহিরে বিরাট বাঙ্গালী জাতি পড়িয়াছিল। তাহারা সোনার সিংহাসনে বঙ্কিমের লেখাকে রাখিয়া পূজা করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া

একের পর এক উপন্যাস রচনা করিয়া যাইতে লাগিলেন। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, ইন্দিরা, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি একের পর এক উপন্যাস তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হইতে লাগিল।

এই সময় তিনি যে শুধু একাই লিখিতেছিলেন তাহা নয়, মাতৃভাষার নিরাভরণ মূর্তি তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছিল। তাই নিজে এবং দেশের প্রতিভাশালী লোকদের দিয়া ভাষাকে সৌন্দর্যশালিনী করিবার স্বপ্ন তাঁহার মনে সতত জাগরুক ছিল। তিনি ১২৭৯ সালে বঙ্গদর্শন নামে উচ্চাঙ্গের এক মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া প্রতিভাবান লেখকদের লেখা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

তিনি বাংলাভাষা ও বাংলা দেশকে কত ভালবাসিতেন তাঁহার প্রত্যেক লেখার ভিতর তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। দেশকে নিবিড় করিয়া ভাল না বাসিলে লেখনীর মুখে এমন স্বদেশ প্রেমের বাণী আসিতে পারে না। তিনি আনন্দমঠে লিখিয়াছেন,

মহেন্দ্র বলিলেন, "এত দেশ, এত মা নয়।"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমি জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্যশ্যামলা দেশ মা।"

দেশকে প্রাণের অপেক্ষা বেশী ভাল না বাসিলে বন্দে-মাতরমের মত গান তিনি রচনা করিতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার মধ্যে সব সময়েই ভারতীয় সংস্কৃতিকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই ভারতীয় নরনারীর আদর্শ তাঁহার লেখায় আরও উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। দেবী চৌধুরাণীর রাণী তাই সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্মান পায়ে ঠেলিয়া দিয়া স্বামীর বাড়ীর বাসন মাজিতে আসিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। চন্দ্রশেখরের প্রতাপ তাই তাহার হৃদয়ের আপনজনকে পাইয়াও গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

তাঁহার সাহিত্যে যথেষ্ট হাস্যরস আছে কিন্তু অশ্লীলতা নাই। লোকরহস্যের ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল নামক প্রবন্ধে ব্যাঘ্রদিগের একটী সভায় বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় কহিলেন, "বিষয়কর্ম আহারান্বেষণ। এখন সভ্য লোক আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম বলে এমত নহে। সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয় কর্ম; অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি, বলবানের আহারান্বেষণের নাম দস্যুতা। লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহৃত হয় না, তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব শব্দ ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্রের প্রয়োজন নাই। এক উদর-পূজা নাম রাখিলে বীরত্বাদি সকল বুঝাইতে পারে।"

এই প্রবন্ধ একা পড়িয়া আপন মনে মুচকি হাসা যায়, বন্ধু-বান্ধবদের সামনে পড়িয়া হো হো করিয়া হাসা যায়,

আবার গুরুজনদের সামনে পড়িয়া নিজেও হাসা যায় তাহা-দিগকেও হাসান যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রবীণ বয়সে সমালোচনা ও ধর্ম সাহিত্যের দিকে মন দেন। কমলাকান্তের দপ্তর, কৃষ্ণচরিত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদরূপে বিরাজ করিতেছে। বিশেষ করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইখানি গ্রন্থে তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৯১ খৃঃ বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকুরীতে ইস্তাফা দেন। গভর্ণমেন্ট তাঁহার কার্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে রায় বাহাদুর ও সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। চাকুরী ছাড়িবার পর তিনি কলিকাতায় হায়ার ট্রেনিং কলেজের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৩০০ সালে ২৬শে চৈত্র তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাহিত্য বাঁচিয়া রহিয়াছে। শুধু বাঁচিয়া রহিয়াছে নয়, সৃষ্টি করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর। তাই আজও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে বাঙ্গালী জাতি স্মরণ করে 'সাহিত্যসম্রাট' বলিয়া।

———

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

টপ্পা গান, খেউড়, কবিগান প্রভৃতির দিনে সাহেবদিগের থিয়েটার দেখিয়া দেখিয়া বাঙ্গালীরা ভাবিত বাংলায় কি নাটক রচনা হয় না? বাঙ্গালীরা কি থিয়েটার করিতে পারে না? সে সাধ মিটাইবার জন্য কত আয়োজন, কত চেষ্টা বাঙ্গালী সমাজে। বাংলায় নাটক নাই, বাঙ্গালীর চেষ্টা নাই, বাঙ্গালী অভিনেতা নাই, বাংলায় থিয়েটারের কোন পরিবেশ নাই। সাহেবদের সঙ্গে যাহারা চলাফেরা করেন, সাহেবদের সঙ্গে যাহাদের কাজের ও ভাবের আদান প্রদান হয় তাহাদেরই উৎসাহে মাঝে মাঝে ইংরাজী নাটকেব তর্জমা অভিনয় করিয়া বাঙ্গালীরা মুগ্ধ হইত। বাংলায় এই সময় এমন একজন মনীষী জন্মগ্রহণ করিলেন যাঁহার একহাতে রহিল নাট্যকারের লেখনী অন্য হাতে রহিল নটের কলাকুশলতা। কথার ছন্দে নাটক সাজাইয়া ভাবের ছন্দে তা প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গালীর নাট্য জীবনের এক নবযুগের সূচনা করিলেন। এই মনীষী শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

গিরিশচন্দ্র ১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। গিরিশচন্দ্র পরপর পাঁচটী ভগ্নীর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি একটু আত্বরে ছিলেন এবং অতিরিক্ত আদর পাওয়ার জন্য একটু জেদী ও দুষ্ট হইয়াছিলেন। গল্প আছে তাঁহার জেঠাই

মা একটী শশা ঠাকুরের জন্য রাখিয়াছিলেন। যেহেতু জেঠাইমা সেই শশাটী খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন সেইহেতু তিনি সেই শশা খাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছিলেন এবং খাইয়াছিলেনও। এইরূপ জেদী ছিলেন বলিয়াই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে বাংলার নাট্য জীবনের এই পরিবর্ত্তন আনিতে পারিয়াছিলেন। তাহা না হইলে ভালছেলে হইয়া তিনি সাহেব কোম্পানীর বুক কিপার হইয়া, ছেলে, নাতি, নাতনী কোলে করিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেন।

গিরিশচন্দ্রের জীবনে নব নব বিপদ, নব নব আঘাত, নব নব আশীর্বাদরূপে আসিয়াছিল। সংসারে যে দুঃখ আছে, জ্বালা যন্ত্রনা আছে, তাহা তিনি ছেলে বয়স হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই দহনের তীব্র অনুভূতি তাঁহার লেখনীমুখে তাই প্রত্যক্ষ আকার ধারণ করিয়া বাহির হইয়াছিল। এই অনুভূতি না থাকিলে এত সুন্দর লেখক তিনি হইতে পারিতেন না। তিনি দশ বৎসর বয়সে বড় দাদাকে হারাইলেন, এগার বৎসর বয়সে মাকে হারাইলেন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে বাবাকে হারাইলেন। নিজের প্রিয়জনকে এইভাবে পর পর হারাইয়া তিনি সংসার সমুদ্রে একা পড়িলেন। সঙ্গী শুধু তাঁহার জ্যেষ্ঠা বিধবা দিদি। দিদিই সংসার দেখাশুনা করিতেন। নবীনচন্দ্র সরকারের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে লগিল। নবীনচন্দ্র তাঁহার একজন অভিভাবক হইবেন এই

আশা করিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী নবীনচন্দ্রের কন্যার সহিত গিরিশ-চন্দ্রের বিবাহ দিলেন। তখন গিরিশচন্দ্রের বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন কিন্তু পারিবারিক নানা দুর্ঘটনার জন্য পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেন। এইখানেই বিশ্ববিদ্যায়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক রহিত হইল কিন্তু বাগ্দেবীর সহিত সম্পর্ক বোধ হয় তাঁহার এসময় হইতে আরম্ভ হইল। তিনি অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন। বাড়ীতে বসিয়া রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কনের চণ্ডী, অন্নদা-মঙ্গল প্রভৃতি বাংলা কাব্যগ্রন্থ সমূহ পাঠ করিতে লাগিলেন এবং বাড়ীতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বাংলা সাহিত্যে তখন একটা জাগরণের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছিল। ইংরাজী সভ্যতা বাংলার মনীষীদিগের প্রাণে এক নূতন উত্তেজনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যকে, বাংলা সমাজকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমাজের সহিত সমান তালে পা ফেলাইবার জন্য তখন কত চেষ্টা চলিতেছিল। তাহাতে হয়ত কিছু ক্ষতি হইয়াছিল কিন্তু সেই সমুদ্র মন্থনে যে হলাহলটুকু উঠিয়াছিল সে যুগের নব্যযুবকশিবরা তাহা পান করিয়া গিয়াছে, আর যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছিল বর্ত্তমান সাহিত্য, সমাজ ও দেশ তাহার প্রসাদ পরম তৃপ্তির সহিত ভোগ করিতেছে। আমরা সেইযুগে পাইয়াছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি লেখককে। তাঁহাদের লেখা পড়িয়া গিরিশচন্দ্র

কাব্য ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঈশ্বরগুপ্তের অনুকরণ করিয়া তিনি কবিতা লিখিলেন।

ধরিয়া মানব কায়   সমভাবে না[illegible]
সুখ দুখ মাঝে হেলে দুলে।
কেমন লোকের মন   দুঃখ নামে অচেতন
সুখ লাভে সকলেই ঢলে॥

এটী তাঁহার প্রথম হাতের লেখা। লেখার লালিত্য বা মাধুর্য্য হয়ত আসে নাই কিন্তু একটী চিরন্তন সত্য যে কবির মনে ধরা দেওয়ার জন্য উঁকিঝুঁকি মারিতেছে তাহা কবিতাটী পড়িলে বুঝা যায়। ইহার পর তিনি ইংরাজী কবিতা পড়িয়া তাহা বাংলা কবিতায় অনুবাদ করিতেন। এইভাবে তাঁহার কাব্য জীবনের বিকাশ হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করে নাই। গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে কোন প্রতিপত্তিশালী অভিভাবক না থাকায় তিনি স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে এক সাহেব কোম্পানীর অফিসে বুককিপারের কাজে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

আগেই বলিয়াছি কলিকাতায় বড় বড় লোকেরা সখের থিয়েটার করিতেন। তাহাতে একখানি টিকিট যোগাড় করিতে পারিলে লোকে যেন কৃতার্থ হইতেন। গিরিশচন্দ্র ঐরূপ একটি থিয়েটার করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইচ্ছা

থাকিলেইত সব কাজ হয় না। তাহার জন্য চাই অর্থ। গিরিশচন্দ্র কোথা হইতে থিয়েটার করিবার মত টাকা পাইবেন। সেই সময় লোকে সখের যাত্রা গান করিতেন। তিনি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে এইরূপ একটি যাত্রা-গানের দল গঠন করেন। এইভাবে তাঁহার নটজীবনের সূত্রপাত হয়। প্রায় এক বৎসর যাত্রাদল বেশ সুষ্ঠুভাবে চলিতে লাগিল। দেশের লোকেরা তাঁহাদের অভিনয় দেখিয়া বেশ তৃপ্তিলাভ করিল। তখন গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা হইল বাগবাজারে একটি সখের থিয়েটার করেন। থিয়েটারের খরচ কমাইবার জন্য অল্প বেশভূষায় দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'সধবার একাদশী' নামক নাটক তিনি অভিনয় করেন। প্রতিভার জ্যোতি সেইদিনের ধুতি, চাদর পরিহিত অভিনেতাদের মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাই অল্প অর্থে যে থিয়েটার করা যায় গিরিশচন্দ্র সে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। সধবার একাদশীর পর তিনি দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী নাটকের অভিনয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া তাহার নাম দিলেন ন্যাশান্যাল থিয়েটার। ইহাই বাঙ্গালীদের প্রথম স্থায়ী থিয়েটার।

উহাতে গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায় লীলাবতী নাটক অভিনীত হয়। লীলাবতী নাটকের অসম্ভব সাফল্য দেখিয়া থিয়েটারের পরিচালকগণ টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন স্বভাব নট ও নাট্যকার। ব্যবসায়ী বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি থিয়েটারে প্রবেশ করেন নাই। তাই তিনি টিকিট বিক্রয়ের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন এবং সাময়িকভাবে থিয়েটার ত্যাগ করেন। শিবহীন যজ্ঞের মত গিরিশচন্দ্র বিহীন ন্যাশান্যাল থিয়েটারের অভিনয় দর্শকদের তেমন মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হইল না। দুই মাস পরে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পরিচালকবর্গ বহু অনুনয় বিনয় করিয়া গিরিশচন্দ্রকে আবার সেই থিয়েটারে ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁহার পরিচালনায় মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনীত হইল। বাংলা থিয়েটার যে এত সুন্দর এত হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে এর আগে তাহা কোন বাঙ্গালী চিন্তা করিতে পারে নাই। গিরিশচন্দ্রের হাতের যাদুস্পর্শে যেন রাতারাতি বাংলার থিয়েটার জগতে এক বিপুল পরিবর্তন হইয়া গেল। যেখানে সামান্য কুটীর ছিল সেখানে মনোরম প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা দেখিয়া মানুষ যেমন বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয় তেমনি কবি ও টপ্পা গানের বদলে অতি অল্পদিনের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের ন্যাশন্যাল থিয়েটার দেখিয়া বাঙ্গালী বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইল। কলিকাতার বুকেই সে আনন্দ ও ও বিস্ময় কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিল না। বাংলা দেশের চারিদিক হইতে সেই থিয়েটারদলের ডাক পড়িল। তাঁহারা চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া থিয়েটারের অভিনয় দেখাইতে লাগিলেন। একটা নূতন আনন্দের বন্যা সারা বাংলাদেশে বহিয়া গেল।

এখানে ওখানে সখের থিয়েটার অভিনীত হইতে লাগিল। কলিকাতায় পর পর বেঙ্গল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার প্রভৃতি স্থাপিত হইল।

অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ভাল নাটকের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। ভাল অভিনয় নির্ভর করে ভাল নাটকের উপর। ইহার অভাব হইলে অভিনয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। গিরিশচন্দ্র অভিনয় করিবার সময় ইহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং মনোমত নাটক লিখিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিলেন। তাঁহার প্রথম নাটক 'মায়াতরু' নামক একখানি গীতিনাট্য। ইহার পর মোহিনী প্রতিমা, আলাদিন, আনন্দরহো, প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক লিখিয়া এবং তাহার অভিনয় করিয়া তিনি বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ নাটকগুলি তাঁহার মনোমত হয় নাই। তিনি কেবল পরীক্ষামূলকভাবে ঐসব নাটক লিখিতেছিলেন। কিভাবে নাটক লিখিলে অভিনয়ে ঠিক ঠিক ভাব প্রকাশ করা যায় তাহার চিন্তায় তিনি অস্থির হইলেন। মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দ যদিও কতকটা অভিনয়ের উপযোগী ছিল তথাপি উহার অক্ষর সংখ্যা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট থাকার জন্য সব সময় ভাব প্রকাশে সমর্থ হইত না। এমন সময় তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম পেচার নক্সা নামক বইখানির প্রচ্ছদপটের কবিতাটি পড়িয়া স্থির করিলেন ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে অর্থাৎ অক্ষরসংখ্যা নির্দিষ্ট না করিয়া যদি নাটক লেখা যায় তবে অভিনয়ের উপযোগী হয়।

এই নূতন ছন্দে নাটক লিখিয়া তিনি জনসাধারণের সম্মুখে আনিলেন। কোন নূতন জিনিষ প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা সাধারণতঃ জনসাধারণ সহসা গ্রহণ করিতে পারে না। প্রতিভা সাধারণ লোকদের চিন্তার অগ্রগামী। সেই অনুসারে তাঁহার নাটক লেখার ছন্দ লোকদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হইল। বহু বিখ্যাত লেখক তাঁহার প্রবর্ত্তিত ছন্দকে ঠাট্টা করিয়া বলিত গৌরিশ ছন্দ। কিন্তু লোকে যত ঠাট্টাই করুক, নিন্দাই করুক না কেন সময়ের কষ্টিপাথরে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে গিরিশচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত ছন্দই নাটকের ভাব প্রকাশের সর্বাপেক্ষা উপযোগী। সামান্য একটি উদাহরণে এই ছন্দের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, প্রাঞ্জলতা ও অভিনয়ের উপযোগীতা বুঝা যাইবে। বুদ্ধদেব চরিত নামক নাটকে বিম্বিসারের প্রতি সিদ্ধার্থের উপদেশ,

করি পুত্রের কামনা
কর-জগন্মাতা উপাসনা
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী ?
জগন্মাতা,
পুত্র তার ক্ষুদ্র কীট আদি,
দেখ নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়।
যদি নৃপ কৃপা নাহি কর
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ ? ইত্যাদি।

এইখানে লেখার ভাব যেভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে এবং অভিনয়ে এ ভাব ফুটাইবার যত সুবিধা হইয়াছে যদি এই লেখার ছন্দ নির্দিষ্ট অক্ষর সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ হইত তাহা হইলে বোধ হয় ইহা তত অভিনয়ের উপযোগী হইত না।

গিরিশচন্দ্র ইহার পর রাবণ বধ, সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, সীতার বনবাস, ভ্রান্তি প্রভৃতি বহু নাটক লিখিয়া অভিনেতাগণের ভাল নাটকের অভিনয় আশা পূর্ণ করেন। নাটক লিখিতে তাঁহার আদৌ সময় ব্যয় হইত না। তিনি বলিয়া যাইতেন আর একজন লিখিয়া যাইতেন। মনে হইত যেন তাঁহার মনে কে একজন একটির পর একটি ছবি আঁকিয়া দিয়া যাইতেছেন তিনি তন্ময় হইয়া তাহা দেখিতেছেন এবং মুখে বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। যিনি লিখিতেন তিনি যদি ঠিক ঠিক লিখিতে না পারার জন্য তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে তিনি বিরক্ত হইতেন। ধ্যানমগ্ন ঋষির বাণী ঈশ্বরেরই বাণী। ধ্যানভগ্ন হইলে সে বাণী কোথা হইতে আসিবে? শেষ জীবনে অভিনয় করা অপেক্ষা নাটক লিখাতেই তিনি মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং বছরের পর বছর নূতন নূতন ভাবের নূতন নূতন নাটক অভিনেতা ও দর্শক সমাজকে দিয়া তিনি তাহাদের কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র যে শুধু নাট্যকার ছিলেন তাহা নয়। তিনি পরের উপকার হইবে বলিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অভ্যাস করেন এবং আপন অধ্যবসায়ে তাহাতেও বিশেষ দক্ষতা

লাভ করেন। অবসর সময়ে বিনা পয়সায় গরীব দুঃখী ও বন্ধু বান্ধবদের ঔষধ দেওয়া তাঁহার পরম আনন্দ ছিল।

আগেই বলিয়াছি দুঃখ লইয়াই তিনি জগতে আসিয়াছিলেন। ছেলে বয়সে মাকে হারাইয়াছিলেন তাহার পর বাবা, ভাই, ভগিনী অনেককে হারাইলেন। শেষে প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নীকে হারাইয়া তিনি শান্তির একটু আশ্রয় খুজিতেছিলেন। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাঁহার চরণতলে তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় পাইয়া শেষ জীবনে অশান্তি আসিলেও তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা তিনি পাইয়াছিলেন। শেষ জীবনে কয়েক বৎসর শীতকালে তিনি হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হইতেন। ১৩১৮ সালের মাঘমাসে তিনি এই রোগে একটু বেশীভাবে আক্রান্ত হন। নানা চিকিৎসা চলিতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল লাভ হইল না। ২৫শে মাঘ রাত্রি প্রায় একটার সময় রামকৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিতে করিতে তিনি মহানিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। সব শেষ হইল। বাঙ্গালী তাঁহার দান ভুলে নাই। বাঙ্গালী তাঁহাকে কালের বক্ষে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য কলিকাতার একটি পার্ক গিরিশ পার্ক নামে অভিহিত করিয়া তাহাতে তাঁহার মর্মর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু মর্মর মূর্ত্তিতে বোধ হয় তিনি বাঙ্গালীর কাছে মূর্ত্ত নয়। নাট্যরসিক বাঙ্গালীর হৃদয়ের আসনে তাঁহার মূর্ত্তি চিরকালের জন্য স্থাপিত।

নবীনচন্দ্র সেন

ইংরাজের আগমনে ভারতের সাহিত্য ক্ষেত্রে যে বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে তাহাতে মহাকাব্য লিখিবার মনোভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন সাহিত্য ক্ষেত্রে ছোট গল্প, ছোট, কবিতার রাজত্ব চলিতেছে। মানুষ এখন কর্ম্মমুখর, দীর্ঘ কবিতার সূত্র ধরিয়া নানাবর্ণের পুষ্পের মালা গাঁথিয়া সে মালার সৌন্দর্য্য উপভোগ্য করিবার ধৈর্য্য পাঠক ও লেখক কাহারও নাই। এখন এক একটী বিশেষ পুষ্পের বিশেষ সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য মানুষ আগ্রহাকুল। তাই বাংলায় মহাকাব্যের শেষ লেখক হিসাবে নবীনচন্দ্র সেনের নাম স্মরণীয় হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উহার পিতার নাম গোপীমোহন ও মাতার নাম রাজরাজেশ্বরী। ইনি ছেলেবেলায় অত্যন্ত দুষ্ট ছিলেন। নবীনচন্দ্র ৮ বৎসর বয়সে পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া চট্টগ্রাম সহরে আসেন। ঐ সময় তাঁহার সাহিত্যের দিকেও দৃষ্টি যায়। তাঁহার বাবা একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার কাকারা যাত্রা গানের পালা ও কবিতা রচনা করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কথা সুর করিয়া দিদিমার কাছে পাঠ করিতে করিতে তিনি এমন এক রাজ্যে উপস্থিত হইতেন যেখানে এ পৃথিবীর সুখদুঃখের লেশমাত্র

পৌঁছিত না; তিনি সব ভুলিয়া যাইতেন। তিনি আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন, "পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, সেইরূপ কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থি মজ্জায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল অস্থির ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।" চট্টগ্রাম স্কুলে পড়িবার সময় তিনি উপাধি পাইলেন, "দুষ্ট শিরোমণি"। দুষ্ট শিরোমণি যখন ছাত্র শিরোমণি হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইলেন তখন সকলেই অবাক হইল।

ইহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন ও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে নবীনচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল ও পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। পিতা পুত্রের জন্য ঋণের বোঝা, একটী নিরাশ্রয় বৃহৎ পরিবার ও তাঁহার সদ্যলব্ধ কলেজী বিদ্যা ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই নবীনচন্দ্র আপন উপার্জ্জন ক্ষমতার প্রথম প্রয়োগ করিলেন হেয়ার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হিসাবে। সেখানে এক মাসের পর চাকুরী গেল। তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন কিন্তু দিশেহারা হইলেন না। তিনি বাংলার লাটের সেক্রেটারীর কাছে গেলেন। তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া শেষ পর্য্যন্ত সেক্রেটারী তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষায় নমিনেশান দিলেন। পরীক্ষায় নবীনচন্দ্র

উত্তীর্ণ হইলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর ভেলা লইয়া তিনি অর্থ চিন্তার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন। কবি মন আপন মনে কাব্য আলোচনা করিবার সুযোগ পাইল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কবির প্রথম কাব্য 'অবকাশ রঞ্জিনী ১ম ভাগ' বাহির হইল। উহা কবির ছেলেবেলার লেখায় ভর্ত্তি। কৈশোরের অতিরিক্ত মমতাবোধ কবির কাব্যে স্থান করিয়া লইয়াছে। তাই যেখানে নিপীড়ন, যেখানে দুঃখ, যেখানে অত্যাচার সেইখানে তাঁহার বীণা করুণ রাগিণীতে বাজিয়া উঠিয়াছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন।

কৃতঘ্ন মা বঙ্গভূমি! এতদিন তব
কবিতা কানন
যেই পিকবর কল উছলিল বনদল
উছলি, ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন
সে মধু সখারে আজি পাষাণ পরাণে
(কি কহিব হায়)
অযত্নে মা অনাদরে বঙ্গকবি কুলেশ্বরে
ভিক্ষুকের বেশে মাতা দিয়াছ বিদায়।

এই ধরণের কবিতা অনেকগুলি ঐ বইতে আছে। কিন্তু এইরূপ ছোট ছোট কবিতা লিখিবার জন্য নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম হয় নাই। বাংলা সাহিত্য তাঁহার কাছে আরও বড় কিছু আশা করিয়া বসিয়াছিল। এই বড়র আগমনী বার্ত্তা ঐ ছোটরা বহন করিয়া আনিয়াছিল মাত্র। ইহার পর বাহির

হইল 'ভারত উচ্ছ্বাস' নামে ছোট একটী কাব্যগ্রন্থ। ভারত উচ্ছ্বাসের পর বাহির হয় 'পলাশীর যুদ্ধ'। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র সিরাজকে বাংলার সিংহাসনচ্যুত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যখানি নবীনচন্দ্রকে বাঙ্গালীর হৃদয় সিংহাসনে চির প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। তিনি যদি আর কোন কাব্যগ্রন্থ না লিখিতেন তাহা হইলেও ঐ একখানি কাব্যগ্রন্থের জন্য বাংলা সাহিত্য যতদিন থাকিবে ততদিন বাঙ্গালীদের গৃহে গৃহে তিনি পূজা পাইবেন।

যখন পলাশীর যুদ্ধ কাব্য রচিত হয় তখন বাঙ্গালীদের অন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্খা ধূমায়িত হইতেছিল কিন্তু স্ফুলিঙ্গ বাহিরে আসিতে পারে নাই। নবীনচন্দ্র সে স্ফুলিঙ্গ বাহিরে প্রকাশ পাইবার পথ তৈয়ারী করিতে লাগিলেন।

কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী।
এ বিষাদ অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে
ডুবায়ে ভারতভূমি যেওনা তপন।

আরও

চল তবে ভ্রাতাগণ, চল পুনর্ব্বার
দেখিব ইংরাজ দল,
শ্বেত অঙ্গে কত বল,
আর্য্য সুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার।

বীর প্রসূতির পুত্র আমরা সকল।
না ছাড়িব একজন
কভু না ছাড়িব রণ
শ্বেত অঙ্গে রক্তস্রোত নাহলে অচল।

এইরূপ বহু কবিতা নিদ্রিত বাঙ্গালী জাতির চেতনায় ঘা দেওয়ার জন্য রচিত হইয়াছিল পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে।

পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি লিখিলেন 'রৈবতক কাব্য'। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা লইয়া এই কাব্য রচিত। মহাভারত হইতে শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' নামে আরও দুইখানি কাব্য তিনি লিখিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মধ্য লীলা ও প্রভাসে তাঁহার অন্তলীলা ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্চ ও নীচ জাতির হিন্দুদের ভিতর মিলনের রাখি বাধিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই মিলনে তিনি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় আছে।

একাকী নির্জনে এক তরুর ছায়ায়
একটী উপল খণ্ডে করিয়া শয়ন
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়
ভাবিতেছি জীবনে ভাবনা প্রথম।

একই মানব সব, একই শরীর ;
একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল,
জন্ম মৃত্যু একরূপ তবে কি কারণ
নীচ গোপ জাতি আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ?

এ প্রশ্ন শুধু শ্রীকৃষ্ণের নয়, এ প্রশ্ন সমস্ত ভারতবাসীর। এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য কত মহাপুরুষ কত পথের নিশানা দিয়াছেন কিন্তু হায় আজও ঠিক পথ বাহির হয় নাই।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচার নামে একটী সভা হয়। উহাতে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হইত। নবীনচন্দ্র এই সভাকে সাহিত্য-সভার রূপ দিতে বিশেষ সাহায্য করেন। উহাই পরে সাহিত্য পরিষদ্ নামে অভিহিত হয়।

নবীনচন্দ্র শেষ বয়সে খৃষ্ট, বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের লীলা প্রসঙ্গ লইয়া তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। খৃষ্ট কাব্যে খৃষ্টের সরল ভক্তিপ্রবণ জীবন ও ধর্ম্মমত আলোচনা করিয়াছিলেন, অমিতাভ কাব্যে বুদ্ধদেবের লীলা ও অমৃতাভ কাব্যে চৈতন্য দেবের লীলা প্রসঙ্গ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মকে তাহার স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইনি নানাভাবে তাঁহার কাব্য গ্রন্থগুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভগবৎ গীতা এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীরও তিনি একটী পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। গুরুভার রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যের ও দেশের যেভাবে সেবা করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

নবীনচন্দ্রের কাব্য গ্রন্থগুলির মত গদ্য গ্রন্থগুলি তেমন সরল ও উপাদেয় হয় নাই। তাঁহার জীবনী "আমার জীবন" পাঁচখণ্ডে বিভক্ত ছিল। উহাতে ডেপুটী নবীনচন্দ্র, হিন্দুধর্ম্ম

সংস্কারক নবীনচন্দ্র, স্বদেশ বৎসল নবীনচন্দ্র, আত্মম্ভরি নবীন-চন্দ্রের পরিচয় পাই কিন্তু কোথাও কবি নবীনচন্দ্রের পরিচয় পাই না। তিনি যে কবি ছিলেন ইহা যেন তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। কবিত্ব শক্তি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে বিরাজিত ছিল। ইহাকে আলাহিদা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিতেন না তাই বুঝাইতে চেষ্টাও করেন নাই।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার জন্য তিনি দীর্ঘদিনের অবকাশ গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সেইজন্য তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তেমনি নিবিড়ভাবে কাব্যদেবীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দেখ হতে পার্ত্তাম নিশ্চয়ই আমি মস্ত একটা বীর,
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির।
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ,
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ,
খোলা তরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ,
তাই বাক্যে বীরই হয়ে রৈলাম আমি চটেমটেই।

এমন হাসির গান ও কবিতার আসরে বাঙ্গালী কবি খুব বেশী আবির্ভূত হন নাই। কাহারও মনে ব্যথা না দিয়া বিমল হাস্যে সভা পরিপূর্ণ করিবার মত সুন্দর কবিতা লিখিতে বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের মত কেহই পারেন নাই। তাই হাসির কবিতা বহু লোকের থাকিলেও হাসির কবিতা লেখক বলিতে সাধারণতঃ দ্বিজেন্দ্রলালকে বুঝায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগর শহরে। উহার বাবা কার্ত্তিকচন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজার দেওয়ান ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের আরও ছয় ভ্রাতা এবং এক ভগিনী ছিলেন। উনি ছিলেন সর্ব্ব কনিষ্ঠ। কার্ত্তিকচন্দ্র সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তিনি যখন তানপুরা সহযোগে মধুর কণ্ঠে রাত্রিতে গান গাহিতেন তখন শিশু দ্বিজেন্দ্রলালের মনে এক মোহময়, স্বপ্নময় রাজ্যের সৃষ্টি হইত। তিনি এ জগৎ ভুলিয়া যাইতেন। তাই ছেলেবেলা হইতে তাঁহারও মনে গায়ক

হইবার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা আসে। কৃষ্ণনগরের বাড়ীর চারিদিকে বেশ সুন্দর বাগান ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, গান, আত্মীয়-স্বজনের প্রীতি, ভালবাসা তাঁহাকে অপার্থিব সৌন্দর্য্যবোধ ও কবিত্বের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। তাঁহার অন্তরের অন্তস্থলে ছিল কবির কাব্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সে কাব্যের ভাষা দিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্মরণশক্তি ছিল অদ্ভুত। একবার পড়িলে বা শুনিলে তাঁহার পাঠ সুখস্থ হইয়া যাইত। কবিতা রচনা করিতে তাঁহাকে এতটুকু চেষ্টা করিতে বা বেগ পাইতে হয় নাই। উহার বয়স যখন ১২ বৎসর তখন উহার এক দাদা নক্ষত্রের দিকে তাকাইয়া তাহার সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিয়া উহাকে গাহিতে বলিলেন। বালক তখনই গাহিলেন।

গভীর নিশীথ কালে নিরজনে আসিয়া
কে তোমরা প্রতিদিন রহ নভ শোভিয়া,
তপন নির্বাণ হলে, ভাষায়ে গগন তলে,
নিশীথ আধারে তব শোভারাশি ঢালিয়া।
কাঁদরে আধারে বসি কেন নিরজনে আসি
প্রভাত না হতে নিশি কোথা যাও চলিয়া।
ইত্যাদি।

বালক দ্বিজেন্দ্রলাল এমনভাবে গানটি গাহিলেন যেন অনেকদিন ধরিয়া গানটি অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতাও অদ্ভুত ছিল।

ইনি যখন এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়েন তখন উহার বক্তৃতা শুনিয়া কৃষ্ণনগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সব গুণ থাকিলেও তাঁহার স্বাস্থ্য মোটে ভাল ছিল না। নদীয়ার ম্যালেরিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ভগিনীকে চিরস্থায়ী প্রজারূপে গণ্য করিয়া রাখিয়াছিল এবং সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইলেই আসিয়া জুলুম করিত। ১৮৭৮খৃঃ তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে যথাক্রমে এফ, এ এবং বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এম, এ পড়িতে আসেন। ঐ সময় ১৮৮২খৃঃ তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্য্যগাথা ১ম ভাগ' প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর বয়সের রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে আর্য্য গাথা নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়।" ঐ বইতেই ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি গাহিয়াছেন,

আয় ভারত সন্তান হয়ে এক প্রাণ,
কত আর দুখে একা গাবি ভাই দুখগান।
একবার সবে মিলে
জাতিভেদ যাও ভুলে,
এ হীন দশায় আর কেন জাতি অভিমান।

কিশোর কবির কিশোর মনে যে সত্য একদিন উদ্ভাসিত

হইয়াছিল তাহাই ভারতবাসীকে তার আত্মচেতনার দিকে ক্রমাগত আগাইয়া দিয়াছিল। দীনা ভারতমায়ের পরাধীনতার শৃঙ্খল কিশোর কবির মনে গভীর দুঃখের রেখাপাত করিয়াছিল, তাই তিনি বড় হইয়া মায়ের সে দুঃখ লাঘব করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়া অধঃপতিত জাতিকে জাগাইয়া তুলিতে এত চেষ্টা করিয়াছেন।

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রি আমার, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ।
সপ্তকোটী সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।

ইহা ছাড়া

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ

ও

ভারত আমার, ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র

প্রভৃতি বহু গানে বাঙ্গালী জাতির ও তথা ভারতবাসীর জাতীয় চেতনাকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃঃ তিনি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সময় তিনি দুরন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন, তাহা সত্ত্বেও তিনি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। স্বাস্থ্য

পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি ছাপরা জেলার এক স্কুলে একশত টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদগ্রহণ করেন। ইহার দুই মাস পরে ইংলণ্ডে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের স্কলারশিপ পাইলেন। বাবা মার কাছে বিলাত যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে তিনি কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন। তাঁহারা স্নেহের নিধি সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানকে তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়সে চোখের আড়াল করিতে কষ্ট বোধ করিলেন। কিন্তু স্নেহ এমনই অন্ধ যে স্নেহপাত্রের সুখ ও মঙ্গলের জন্য তাহাকে দূরে প্রেরণ করিয়া নিজে দুঃখের কষাঘাতে জর্জরিত হওয়াতে সুখ। তাই বাবা বা মা দ্বিজেন্দ্রলালকে বিলাত যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি বিলাতে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। লেখাপড়া শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে কবিতা লেখার অভ্যাসও করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাত প্রবাসকালীন কবিতার বই Lyrics of the Ind বহু খ্যাতনামা ইংরাজের প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অনেক ইংরাজ বন্ধু তাঁহাকে ইংলণ্ডে থাকিয়া ইংরাজী ভাষার চর্চা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। কোট প্যাণ্টালুনের ভিতর ধুতি চাদর পরা তাঁহার খাঁটী বাঙ্গালী মনটী সব সময় জাগিয়াছিল। তাই তিনি তাঁহাদের সে অনুরোধ হেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তিনি কৃষি বিষয়ে

ডিপ্লোমা লাভ করেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার পিতামাতা পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৮৬ খৃঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি দেশে আসিয়া বাংলার ছোটলাটের সহিত সাক্ষাত করেন; কিন্তু তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতির কথাবার্ত্তা শুনিয়া ছোটলাট সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সুতরাং বিলাত-ফেরৎ হইয়াও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরীই তাঁহার ভাগ্যে লাভ হইল। এই সময় হিন্দুসমাজ তাঁহার উপর ভাল ব্যবহার করে নাই। তিনি কিন্তু নিজ দৃঢ়তার উপরই দণ্ডায়মান রহিলেন এবং বিলাত যাওয়ার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করিলেন না। তাঁহার মনের ক্রোধ ও উত্তেজনা তিনি 'একঘরে' নামক একখানি পুস্তিকায় লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুরবালার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার পর চাকুরী ব্যপদেশে তিনি বাংলা ও বিহারের বহু জায়গায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু অবসর সময়ে কাব্যলক্ষ্মীর সেবা করিতে কোনদিনই তিনি কষ্ট বোধ করেন নাই।

এই সময় 'আর্য্যগাথা ২য় ভাগ', 'আষাঢ়ে', 'মন্দ্র' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, 'পাষাণী', 'সীতা', 'তারাবাই' প্রভৃতি নাটক, 'বিরহ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বহুতআচ্ছা' প্রভৃতি প্রহসন তাঁহাকে বাঙ্গালী সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। এই সময় তাঁহার বিশেষ সুখের সময় ছিল। গভর্ণমেণ্টের চাকুরী, জাতির ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, স্ত্রীর অনুপম প্রেম, তাঁহার জীবন আনন্দময়

ও মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তাঁহার হাসির সর্ব্বোৎকৃষ্ট গানগুলি ঐ সময় রচিত হয়। কিন্তু এত সুখ মানুষের ভাগ্যে সহ্য হয় না। তাই একদিন হঠাৎ তাঁহার ভাগ্যাকাশের উজ্জ্বল তারকাটী নিভিয়া গেল। ১৯০৩ খৃঃ নভেম্বর মাসে অপ্রত্যাশিতভাবে সুরবালা দেবী সুরলোকে চলিয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের সুর ও ভাষা মিলাইয়া গেল। তিনি ইহার পর আর হাসির গান রচনা করিতে পারেন নাই। প্রবাসীতে ইহা লইয়া তিনি একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন।

হাস্য শুধু আমার সখা, অশ্রু আমার কেহই নয় ?
হাস্য করে অর্দ্ধ জীবন করেছি ত অপচয়।
চলে যারে সুখের রাজ্য দুঃখের রাজ্য নেমে আয়,
গলাধরে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়।
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে বসবাস,
ইহাই আমার ব্রত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।

স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই। পুত্র দিলীপকুমার ও কন্যা মায়াই তাঁহার জীবনের শেষ সম্বল হইল। তাঁহার স্ত্রী পাকা গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থে ২নং নন্দকুমার চৌধুরী লেনে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দিলেন "সুরধাম"। এই বাড়ীতে অবস্থান করিয়া তিনি কলিকাতায় চাকুরী করিতেছিলেন। এই সময় তিনি দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবারপতন, সাহজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি নাটকগুলি রচনা করেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর তাঁহার স্বাস্থ্য

ভাল যাইতেছিল না। তাই ১৯০৮ খৃঃ দীর্ঘদিনের ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। এই সময় তিনি ভীষ্ম নাটক ও ত্রিবেণী নামক কবিতার বই রচনা করেন। এই সময়ের তাঁহার প্রত্যেকখানি বইএর ভাষা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, উহাতে হাস্যরসের লেশমাত্র নাই।

দীর্ঘ অবকাশ ভোগের পর ও তাঁহার শরীর সারিল না। তিনি কলিকাতার কাছাকাছি জায়গায় বদলী হইলেন। কিন্তু কিছুতে তাঁহার শরীর আর চাকুরীর খাটুনী সহ্য করিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া সুখে তিনি বেশী দিন বাঁচিতে পারেন নাই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে তাঁহার দুঃখময় জীবনের অবসান হয়। কবি মৃত্যুর সময়ের যে কল্পনাটী করিয়াছিলেন মৃত্যুর সময়ে তাহা পূর্ণ হইল না।

তবে এক সাধ আছে মরিব যখন, কাছে
রহে যেন ঘেরি প্রিয়া, পুত্র কন্যাগণ।
আর বন্ধু যদি কেহ, করে ভক্তি করে স্নেহ
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন,
দেখি যেন শ্যামধরা শস্যভরা পুষ্পভরা
এতদিন যাহাদিগে বাসিয়াছি ভালো।

হায় কাল কয়জনেরই বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকে?

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যিকের মৃত্যুতে লিখিয়াছিলেন,

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয়ে তারে রাখিয়াছে বরি।
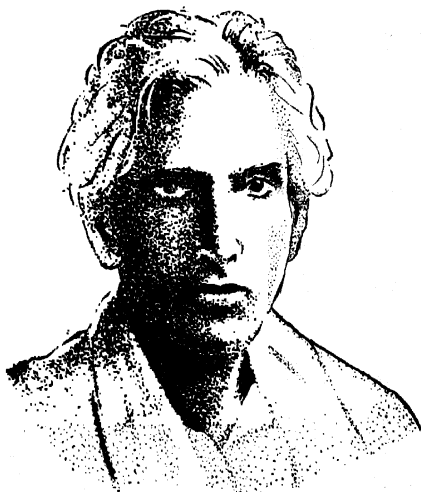
সেই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র দরদী লেখার সাহায্যে দুঃখ দারিদ্রপূর্ণ উৎপীড়িত বাঙ্গালী সমাজের নিখুঁত ছবি আঁকিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর অন্তরে স্থান করিয়া লইয়াছেন। যে বাঙ্গালী

মাঠে লাঙ্গল করে, যে বাঙ্গালী মেয়ে স্বামীর জন্য দুঃখের অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভাঙ্গা ঘরের কোনে অপেক্ষা করে, যে বাঙ্গালী কাপড় কাচে, যে বাঙ্গালী মাথায় মোট বহিয়া জীবিকার সংস্থান করে, যে বাঙ্গালী রমণী সমাজের নানা অত্যাচার মাথায় বহিয়া তাহার আদর্শে চালিত হয়—শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে সেই সব বাঙ্গালীর আসন ছিল। তাই সেই সব বাঙ্গালী শরৎচন্দ্রকে অন্তরের আসন দিয়াছে।

শরৎচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন সাধারণ বাঙ্গালীর গৃহে। দুঃখ-দারিদ্র্য প্রায় তাঁহার সমস্ত জীবনের সঙ্গী ছিল। তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হইয়াছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাইনি .....ইত্যাদি।" এই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে তিনি এত ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহার অন্তরের কবি মন ও সাহিত্যিক প্রতিভা ৩৫ বৎসরের ভিতর বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

হুগলী জেলার দেবানন্দপুর নামক ছোট একটী গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় কার্য্যোপলক্ষ্যে ভাগলপুরে বাস করিতেন। সেইজন্য শরৎচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের অনেক সময় ভাগলপুরে অতিবাহিত হয়। ১৮৮৭ খৃঃ ভাগলপুরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি

কিছুদিনের জন্য দেবানন্দপুরে আসেন এবং হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হন। প্রকৃতি ছিল তাঁহার খেলার সাথী। তাহার সহিত মিশিতে পারিলে তিনি বাঁচিয়া যাইতেন। নদীর পাড়, বনের ধার, ফলফুল চুরির কারবার তাঁহার ছেলেবেলার কাজের সাথী ছিল। এই সঙ্গে ছিল তাঁহার লুকাইয়া বেড়াইবার অভ্যাস। এক এক সময় গোপনে তিনি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন। কয়েকদিন এদিক ওদিক বেড়াইয়া আবার বাড়ীতে প্রকাশ হইতেন। অন্ধকারের যে রূপ আছে, নদীর কুলুকুলু ধ্বনির যে সুর আছে, বনানী ছায়ার যে মায়া আছে, এ তাঁহার কবির কল্পনা নয়, এ তাঁহার বাস্তবের অনুভূতি।

কিছুদিন বাংলাদেশে থাকিবার পর তাঁহাকে আবার ভাগলপুরে যাইতে হয়। ঐখানে ১৮৯৪ খৃঃ তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আগেই তিনি ছোট ছোট গল্প লিখিতে থাকেন। মতিবাবু অনেক ছোট ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোন গল্পের সমাপ্তি তিনি টানেন নাই। সেই সব অসমাপ্ত রচনা শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে। কল্পনার চক্ষে তিনি সেই সমস্ত অসমাপ্ত রচনার সমাপ্তি টানিতে থাকেন। সেই হইতেই তিনি নিজে সম্পূর্ণ গল্প লিখিবার প্রেরণা পান। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি এফ, এ, পড়িতে জুবিলি কলেজে ভর্ত্তি হন। উদ্দেশ্য আইন পড়া। কিন্তু উকীল হইয়া দরদী

মনকে অদরদী করা অপেক্ষা গান, বাজনা, অভিনয় প্রভৃতি তাঁহার অধিকতর প্রিয় বস্তু ছিল। সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল দুষ্ট সরস্বতী। গল্প ও কবিতা লেখা তাঁহার কলেজ পাঠ্যের স্থান অধিকার করিয়া লইল। দিন বেশ অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার বিধান ছিল অন্য রকম। সহসা তাঁহার মাতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পড়ার সেইখানেই সমাপ্তি হইল। তিনি চাকুরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চাও তাঁহার পুরাদমে চলিতে লাগিল। যমুনা ও সাহিত্য নামক মাসিকপত্র দুইখানি তাঁহার ছেলেবেলার লেখা পাষাণ, বোঝা, কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম, বড়দিদি প্রভৃতি গল্প ধরিয়া দিল বাঙ্গালী সমাজের সম্মুখে। সাহিত্যের আসরে তাঁহার আসন মিলিল। সাহিত্য করিলে মনের ক্ষুধা মিটিতে পারে কিন্তু পেটের ক্ষুধা মিটে না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চাকুরী লইতে হইল। চাকুরীর বাঁধা-ধরা পথ তাঁহার বাঁধনহারা মনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তিনি চাকুরী ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন সংসারের মুক্ত পথে সন্ন্যাসী হইয়া। এখানে ওখানে ঘুরিয়া তিনি শেষে মজঃফরপুরে ফিরিলেন। সেইখান হইতেই তিনি খবর পাইলেন, তাঁহার বাবা মারা গিয়াছেন। খবর পাইয়াই তিনি ভাগলপুরে চলিয়া আসেন। পিতার শ্রাদ্ধ-কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া ভাই-ভগ্নীদিগকে আত্মীয়দের আশ্রয়ে রাখিলেন, তাহার পর তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলেন ব্রহ্মদেশের দিকে।

দেশের মাটী ছাড়িয়া গেলেন কিন্তু দেশ-মায়ের স্মৃতি তাঁহার অন্তরে জাগিয়া রহিল। বাঙ্গালী ভুলিয়া গেল শরৎচন্দ্রকে, শরৎচন্দ্র ভুলিয়া গেলেন না বাঙ্গালীকে। নীরবে বাংলা ভাষার বেদীমূলে সাধনা চলিল শরৎচন্দ্রের। দশ বার বৎসর পরে একদিন তাঁহার আবার ডাক পড়িল বাঙ্গালী সমাজে। তৎকালীন যমুনা নামক মাসিক পত্রিকার নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য শরৎচন্দ্রের ডাক পড়িল। তাঁহার লিখিত রামের সুমতি, পথনির্দ্দেশ, বিন্দুর ছেলে, যুগপৎ যমুনাকে অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে এবং তাঁহাকে বাঙ্গালী জাতির অকাল-বিস্মৃতির পথ হইতে বাঁচাইল। আবার শরৎচন্দ্র বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে দেখা দিলেন। যমুনার সহিত ভারতবর্ষেও কিছু কিছু তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার লেখা বিরাজ বৌ উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

রেঙ্গুণে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। চিকিৎসকদের পরামর্শে সেখানকার একশত টাকার চাকুরী ছাড়িয়া তিনি ১৯১৬ খৃঃ আবার বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। রেঙ্গুণ হইতে ফিরিয়া তিনি বাজেশিবপুরে একটি বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন। যমুনা, সাহিত্য ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিকে নিয়মিত তাঁহার লেখা পাঠক-সমাজের নিকট পরিবেশিত হইতে লাগিল। অতি অল্পদিনের ভিতর উত্তম লেখক বলিয়া তিনি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট পরিচিত হইলেন।

তাঁহার লেখার ছুইটি গুণের জন্য তিনি পাঠক-সমাজে এত সহজে আদৃত হইয়াছিলেন। তিনি সাধারণ বাঙ্গালী গৃহের তথ্য দরদী ভাষায় প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ভাষার ভিতর জড়তা বা দুর্ব্বোধ্যতা ছিল না। সহজ ও সরল ভাষায় সরল-ভাবে তিনি মনের কুটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছিলেন, ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাই তাঁহার লেখা এত হৃদয়গ্রাহী ও ভাবস্ফুট হইয়াছিল। রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে নামক গল্প দুইটিতে পারিবারিক জীবনের সহিত ছোট ছেলেকে সংসার-যাত্রায় গড়িয়া তুলিবার যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। আর কোন লেখকের লেখনীতে এত সুন্দর রচনা বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি শুধু কলমেই দরদী ছিলেন না। মনের অন্তস্তলে করুণার উষ্ণ প্রস্রবণ তাঁহার সর্ব্বদা ক্ষরিত হইত। কাহারও দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তিনি আপনার সব কথা ভুলিয়া যাইতেন। খুব ছোটবেলা এক সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব নৃত্যে তিনি এক তেঁতুল গাছের তলায় একটি ইঁদুরকে মৃতপ্রায় দেখিতে পান, ঝড়ের তাণ্ডব ভুলিয়া তিনি ইঁদুরের পরিচর্য্যায় লাগিয়া যান। শরৎচন্দ্র মধ্যে মধ্যে তাঁহার দিদির বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন। সেখানের গরীব দুঃখীদের জন্য খুচরা পয়সা ও ছোট ছোট কাপড় সব সময় তিনি লইয়া যাইতেন। তিনি শুধু দয়াবান ও হৃদয়বান ছিলেন না, স্নেহের কোমল স্পর্শ তাঁহার সমস্ত মনে জড়াইয়া

ছিল। সে স্নেহ আবার শুধু মানুষেই পর্য্যবসিত ছিল না ; মানুষেতর জীবজন্তুও সে স্নেহের অংশীদার ছিল। শিবপুরের বাসায় তাঁহার ভেলু নামে একটি কুকুর ছিল। সেই কুকুরটি যখন মারা যায় তখন তিনি কয়েকদিন স্নানাহার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। আত্মীয় পরিজনের মত কুকুরকে তিনি সমাধিস্থ করিয়াছিলেন।

এইরূপ স্নেহ ও দয়ার ছায়াতলে বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, নিষ্কৃতি প্রভৃতি লেখাগুলির অঙ্কুর মেলিতেছিল।

রেঙ্গুণ হইতে ফিরিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়িবেন। কিন্তু অতি অল্পদিনের ভিতর তাঁহার সে ভয় দূরীভূত হইল। বাগ্‌দেবী তাঁহার জন্য যশই আনিলেন না, যশের সহিত কাঞ্চনও আনিলেন। তাঁহার লেখাগুলি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে এত প্রিয় হইয়াছিল যে, বই বিক্রিতে তাঁহার মাসিক আয় প্রায় ৫০০৲ টাকা হইয়াছিল। তিনি সহরের কোলাহলময় অঙ্গন অপেক্ষা প্রকৃতির নীরব প্রান্তর অধিক ভালবাসিতেন। সেইজন্য এগার শত টাকা দিয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাণিত্রাস গ্রামে কিছু জমি কিনিয়া তাহাতে একটি গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই নিরালা গৃহের কোণেই তাঁহার নামকরা উপন্যাসগুলি লিখিত হইয়াছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরিচালিত নারায়ণ পত্রিকায় তাঁহার "স্বামী" নামক গল্পটি প্রকাশিত হয়। ঐ গল্পটি পড়িয়া

দেশবন্ধু মুগ্ধ হন এবং শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাঁহার প্রেরণায় শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দেন এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সেবক হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেন।

তিনি ভাল লেখক হইলেও ভাল বক্তা হইতে পারেন নাই। সভা-সমিতি তিনি যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিলেও লোকে ছাড়িবে কেন? তাঁহাকে বহু সম্মেলনে সভাপতির আসন বরণ করিতে হইয়াছিল। সাহিত্য-সেবার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার-স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক দান করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, লিট্, উপাধিতে ভূষিত করেন।

শেষ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি দেওঘরে যান কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কলিকাতায় বড় বড় চিকিৎসকের পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় তাঁহার পাকস্থলীতে ক্যানসার হইয়াছে। অস্ত্রোপচার ব্যতীত উপকার লাভ করা অসম্ভব জানিয়া ডাক্তাররা তাঁহার পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করেন। ভগবানের দরবারে তাঁহার ডাক আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই মানুষের কোন চেষ্টাই এ পৃথিবীতে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ তিনি তাঁহার সুখ-দুঃখভরা পৃথিবী ছাড়িয়া আনন্দময় অজানা ধামে চলিয়া গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ বাঙ্গালীদের স্মরণপটে চিরদিনের জন্য গ্রথিত থাকিবার মত একটি দিন। ঐ দিনে
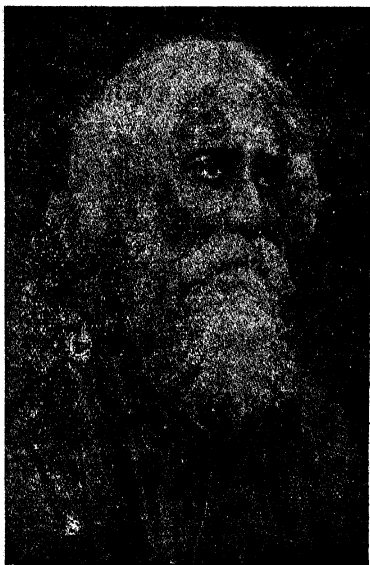
এমন একজন মহাপুরুষ বাংলার আলোকে বাতাসে আসিলেন যিনি ভবিষ্যৎ জীবনে বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বের দরবারে

স্থান করিয়া দিলেন। এই মহাপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঠাকুর পরিবার চিরদিনই সাহিত্যের উপাসক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশানুগত অধিকার হিসাবে সাহিত্যের প্রতি একটি দুর্নিবার হৃদয়াবেগ লাভ করেন। সেইজন্য অন্য ছেলেরা যখন 'জল পড়ে, পাতা নড়ে', কেবল পড়ার জন্যই পড়িয়া যায় তখন তাঁহার কবি-মনে জল পড়া ও পাতা নড়ার ভিতর ঘন-সবুজ-পত্র-শোভিত বর্ষামুখর বাংলার শ্রীটি জাগিয়া উঠে। কোথায় থাকে তাঁহার পড়া মুখস্থ, কোথায় থাকে তখন পাঠশালা! যে অপূর্ব্ব শ্রী তাঁহার মানসচক্ষের দ্বারপথে উদয় হয়, সে তথ্য পণ্ডিত মহাশয় পাইবেন কোথা হইতে? তাই পণ্ডিত মহাশয় অন্যমনস্ক বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন।

স্কুলের আবহাওয়া তাঁহার বেশী দিন ভাল লাগে নাই। তাই তিনি স্কুলের পড়া ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে পড়িতে থাকেন। এখানে স্কুলের পরীক্ষা পাশের জন্য পড়িতে হইত না কিন্তু সংসার যাত্রার পরীক্ষায় পাশের জন্য পড়িতে হইত। তাই স্কুলের পাঠ্য বিষয় অপেক্ষা এখানের পাঠ্য বিষয় অনেক বেশী ছিল। চারুপাঠ, বস্তু-বিচার হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্য, সঙ্গীত, শরীর-চর্চ্চা প্রভৃতি কোন বিষয়ই বাদ পড়িত না। কিন্তু তবু স্কুল অপেক্ষা ইহা তাঁহার ভাল লাগিত। সমুদ্রের বিশালতার মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার অধিকার গণ্ডীবদ্ধ কূপের

বৈচিত্র্যহীন জীবন অপেক্ষা তাঁহার কাছে অনেক প্রিয় ও আরামপ্রদ বলিয়া মনে হইত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবন আরম্ভ হয় অদ্ভুতভাবে। যখন তাঁহার মাত্র সাত আট বৎসর বয়স, সেই সময় জ্যোতিঃপ্রকাশ নামে তাঁহার এক ভাগিনেয় এক দুপুর বেলা তাঁহাকে পদ্য লিখিতে বলেন। রবীন্দ্রনাথ পদ্য পড়িতে ভালবাসিতেন। সেই পদ্য যে নিজের মন হইতে মিলাইয়া মিলাইয়া রচনা করা যায় তাহা তাঁহার ধারণা ছিল না। সেই ভাগিনেয়ের চেষ্টায় শব্দের মিল দেওয়ার খেলায় মাতিয়া যখন তিনি দেখিলেন বেশ পদ্য রচনা করা হইয়াছে তখন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না। নূতন শিক্ষার্থী যখন একবার সফলকাম হয় তখন তাহার উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের তাহাই অবস্থা হইল। তাঁহার বাঁধান নীল খাতাটি বাঁকা বাঁকা লাইনে সরু মোটা অক্ষরে মৌচাকের মত ভরিয়া গেল।

সাতকড়ি দত্ত নামে রবীন্দ্রনাথের এক মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এক একটি কবিতার কয়েক লাইন বলিতেন, রবীন্দ্রনাথ আর কয়েকটি লাইন দিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। যেমন তিনি বলিতেন,

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

এমনি করিয়া গৃহের গণ্ডীর ভিতর এক কালে যে অঙ্কুর দুইটি সবুজ পত্র বিস্তার করিতেছিল তাহা পরে বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়া জগতের এক বিস্ময় হইল। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিবার দিকেও রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য যায়। এই ভাবে স্বর্গের গান ও কবিতার মধ্যে ডুবিয়া পৃথিবীর মাটীতে তিনি মানুষ হইতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতা প্রায়ই বাহিরে থাকিতেন। পর্ব্বত, নদী, নির্জ্জন মাঠ ছিল তাঁহার প্রিয় স্থান। অনেক দিন পর পর তিনি একবার বাড়ী আসিতেন। এমনি একবার বাড়ী আসিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথকে হিমালয় ভ্রমণে লইয়া যান। পথে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন তাঁহারা অতিবাহিত করেন। লোকালয়ের কোলাহলের বাহিরে যে অনন্ত চঞ্চলময়, প্রাণবন্ত প্রকৃতি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিবার চক্ষু কয়জনের থাকে? কিন্তু যাহারা দেখিতে পায় তাহারা আর জনকোলাহলের ভিতর যাইতে চায় না। কবির অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। সেই সময় হইতে বাহির বিশ্বের অনন্ত প্রকৃতির সহিত তাঁহার জীবন মিলিয়া গেল। তিনি গাহিলেন,

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথায় করিছে কোলাকুলি।

বাহির বিশ্বে যাইবার, বাহির বিশ্বকে আপনার মাঝে উপলব্ধি করিবার অত্যুগ্র কামনা তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। সেই বাহির বিশ্বের অনন্ত সুর, অসীম প্রেম নিজের জীবনে উপলব্ধি

করিবার সাধনাই তাঁহার জীবন। হিমালয় হইতে ফিরিয়া তিনি তাঁহার সেজ দাদার সহিত বিলাত গেলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতের বৎসর। বিলাত যাওয়ার পথে ইটালী ও ফ্রান্স দেখিয়া গেলেন। সেখানকার স্বাধীন ও পৌরুষভাব পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ রবীন্দ্রনাথের মনে এক গভীর রেখা টানিয়া দিল। সেই মন লইয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন। বিদেশের স্বাধীনতার ভাবটুকু তাঁহার মনে একরকম নেশার মত লাগিয়াছিল। ঘরের কোণে বসিয়া থাকা বা একঘেয়েমী কোন কাজ করা তখন তাঁহার পছন্দ হইত না। ইহার অপেক্ষা তাঁহার মনে হইত,

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।

কবিতায় গানে জীবনের ত্রিশটি বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি এই সময়ের সাধনায় বাঙ্গালী পাঠক পাইল।

এতদিন কবির জীবন ছিল শুধু কাব্যময়। সংসারের হাসি, আনন্দ, উৎসব ছাড়া যে আর একটি দিক আছে তাহার সহিত কবির খুব বেশী পরিচয় হয় নাই। এইবার কবিকে কিছু কিছু

জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতে দেওয়া হইল। কর্ম্মময় হাসি-কান্নাময় পৃথিবীর জীবনের সহিত পরিচিত হইয়া কবি লিখিয়াছেন, "যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্ছি ততই কাজ জিনিষটার পরে শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। কর্ম্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ, সেটা কেবল পুঁথির উপদেশ রূপেই জানতাম। এখন জীবনেই অনুভব করছি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা, কাজের মধ্য দিয়েই জিনিষ চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে।"

বাস্তব জগতের দরজাটা কবির সম্মুখে খুলিয়া গেল। সংসারের নানাদিক হইতে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তাঁহার ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মানুষের জীবনকে ও জীবনাদর্শকে তিনি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া সেই উপলব্ধি অক্ষরের মায়াজালে সকলের জন্য আলোক-বর্ত্তিকার মত রাখিয়া গেলেন। তিনি শুধু কবিতাই লিখিলেন না ; নাটক, ছোট গল্প, গীতিনাট্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহার লেখনী প্রসারিত হইল। ভাব, ভাষা, ছন্দ, সুর মিলিয়া বাংলা ভাষায় তিনি এক নব জীবনের প্রবাহ আনিয়া দিলেন।

কুখ্যাত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ আসিল। বাংলার সঙ্ঘশক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দিলেন। সে দিন বাঙ্গালী দেশ-বিভাগকে বন্ধ করিবার জন্য যে আন্দোলন তুলিয়াছিল, কবি সে আন্দোলনে পিছাইয়া পড়েন নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি কত

জায়গায় গিয়াছেন, কত জায়গায় সভা করিয়াছেন! পরাধীনতার নিগড়ে নিঃশেষিতপ্রায় বাঙ্গালী জাতিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য কত প্রাণমাতান গান রচনা করিয়াছেন, গাহিয়াছেন! এইসব গান কত স্বদেশপ্রেমিকের বুকে বল, মনে সাহস যোগাইয়াছে!

এদেশের সাধারণ লোকদের দুঃখ-দুর্দ্দশাময় জীবন তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল। কি করিয়া তাহারা আপনাদের চেতনাকে লাভ করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহার জন্য কবির চিন্তার সীমা ছিল না। নানা কবিতার মধ্য দিয়া এইসব নিষ্পেষিত জীবনে অফুরন্ত প্রাণের স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,

এইসব মূঢ় ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে। ইত্যাদি

১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার বিলাত যাত্রা করেন। আগের বারের মত তিনি আর অখ্যাত রবীন্দ্রনাথ নয়। তাঁহার কবি-প্রতিভার খবর বিশ্ব-জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় তিনি তাঁহার কতকগুলি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইংরাজী গীতাঞ্জলি বাহির করেন।

এই কবিতাগুলির ভাবধারা বস্তুতান্ত্রিক ইউরোপের বুকে নূতন এক ভাবের বন্যা আনিয়া দিল। ইহার পুরস্কার স্বরূপ ১৯১৩ খৃঃ তিনি নোবেল পুরস্কারের এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা লাভ করিলেন। তিনি প্রথম এশিয়াবাসী হিসাবে এই পুরস্কার লাভ করিলেন। যশের মুকুট মাথায় লইয়া তিনি বাংলায় ফিরিলেন। সেদিন বাঙ্গালীর কি আনন্দের দিন! বাংলায় ফিরিয়াই তিনি পুরস্কারের সমস্ত টাকা লইয়া শান্তি-নিকেতনকে নূতন ছাঁচে তৈয়ারী করিতে মন দিলেন। নির্জনে আরাধনার জন্য তাঁহার পিতা বোলপুরের ভুবনডাঙ্গায় ছাতিম গাছের তলায় যে শান্তির আশ্রমটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে সেই শান্তিনিকেতন এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল। সেখানের আশ্রম-বিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র কবির নিজের তত্ত্বাবধানে সংসারাশ্রমে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। শিক্ষক সেখানে ছাত্রের শুধু গুরু নয় বন্ধুও বটে। ভীতির বেত্রদণ্ডে ছাত্রদের পড়া সেখানে প্রস্তুত হইত না, স্নেহ ও প্রেমের যাদুদণ্ডে তাহাদের পড়া প্রস্তুত হইত। গাছের শান্ত ছাওয়ায়, শিক্ষকের স্নেহ ধাওয়ায়, গুরুর সদা মঙ্গল কামনায়, খেলাধূলা, গান, গল্প ও আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার এক অভিনব ধারা এখানে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীর বহু প্রখ্যাতনামা মনীষী তাঁহার শিক্ষার এই পরিকল্পনা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই এখন এই বিদ্যালয় একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রূপায়িত হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের সহিত আছে

শ্রীনিকেতন। ঐখানে ছাত্রেরা হাতের কাজকর্ম্ম শিখিয়া জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের যোগসূত্র স্থাপন করে।

কবি তাঁহার বিশ্বজনীন আদর্শকে শান্তিনিকেতনে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর বহুদেশের পণ্ডিত ব্যক্তির সহযোগিতায় তাহা কিছু পরিমাণে সফল হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বড় বড় আদর্শ লইয়াই মাথা ঘামান নাই। তাঁহার মন ছিল আনন্দময়। তাই যেখানে আনন্দ ও রসের কিছুমাত্র যোগান ছিল সেখানে তিনি গিয়াছেন এবং কাব্যের অপরূপ কথা-মালিকায় সেই রসের আস্বাদ সকলের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। শিশুদের হিজিবিজি লেখা, কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্মের ভিতর তিনি অনন্ত রসের খনির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহাদের জন্য রচিত কবিতাগুলির মধ্যে তাহাদের জন্য অনন্ত দরদ ও ভালবাসা রাখিয়া গিয়াছেন।

আমার খোকা সকল কথা জানে।
কিন্তু তার এমন ভাষা
কে বুঝে তার মানে
মৌন থাকে সাধে ?

মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তার কি আকুলতা
তাকাই তাই বোবার মত
মায়ের মুখ চাঁদে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুদেশে তিনি গমন করিয়াছিলেন। সেই যাত্রায় যেমন তিনি নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়া-

ছিলেন তেমনি অন্যান্য দেশও কবির সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মান, রাশিয়া, চীন, জাপান, জাভা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি যে সমস্ত জায়গায় তিনি গিয়াছেন, সেই সমস্ত জায়গাতেই তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইয়াছেন।

কাল চলিয়া যায়। কবির এ পৃথিবীতে থাকিবার কাল পূর্ণ হইয়া আসে। ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ ৮১ বৎসর বয়সে শ্যাম শোভাময় এ ধরণীর মাটিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সংবাদ যখন প্রচারিত হইল তখন চারিদিকে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। সমস্ত দেশ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার চিরন্তনী বাণী দেশকে শোকের সাগর হইতে উদ্ধার করিল।

কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি
সকল খেলায় করবো খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসবো যাবো চিরদিনের সেই আমি।

কবির আত্মপ্রকাশ রইল ছবি ও গান, মানসী, সোনার তরী, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে; বিসর্জন, ডাকঘর প্রভৃতি নাটকে; গোরা, ঘরে বাইরে প্রভৃতি উপন্যাসে; কাবুলি-ওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি গল্পে; সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে।

সমাপ্ত